বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সদস্যদের মাসিক স্টাডিসার্কেলের পাঠ্যসূচী-২০২৬

প্রিয় ভাই ও বোন,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আশাকরি আল্লাহর রহমতে ভাল থেকে দ্বীনের এ কঠিন দায়িত্ব যথাযথ ভাবে আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। জাতীয় নির্বাচন পরবর্তিতে বার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে সকল পর্যায়ে একদল নি:স্বার্থ দায়ী, দক্ষ সংগঠক, আল্লাহভীরু-ত্যাগী সমাজনেতা তৈরীর লক্ষ্যে নিম্নে পাঠ্যসূচী প্রদান করা হলো-

মার্চ-২১ কুরআন অধ্যয়ন: সূরা হুজুরাত ১ম রুকু	০২
বই ঃ ইসলামী আন্দোলন সাফল্যের শর্তাবলী	১১
এপ্রিল-২১ কুরআন অধ্যয়ন: সূরা আর রা'দ (২২-২৬) নং আয়াত	১৩
বই: হেদায়াত	২১
মে-২১ কুরআন অধ্যয়ন: সূরা আল কাহফ (২৭ ও ২৮) নং আয়াত	২৩
বই ঃ ইসলামী আন্দোলন নৈতিক ভিত্তি	২৭
জুন-২১ কুরআন অধ্যয়ন: সূরা ফুরকান (৬১-৭৭) নং	২৪
বই ঃ গঠনতন্ত্রের ধারা-২,৩,৪,৫,৬,৭,৯,১০,১১,৫৩, পরিশিষ্ট-১	২৮
জুলাই-২১ কুরআন অধ্যয়ন: সূরা ইয়াসিন (২০-২৯) নং আয়াত	৩০
বই ঃ রুকনিয়াতের আসল চেতনা	৩২
আগষ্ট-২১ কুরআন অধ্যয়ন: সূরা মুনাফিক (৯ ও ১০) নং আয়াত	৩৪
বই ঃ ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ	৩৬
সেপ্টেম্বর-২১ কুরআন অধ্যয়ন: সূরা তওবা (৬ষ্ট রুকু) নং আয়াত	৩৮
বই: ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি	৪০
অক্টোবর-২১ কুরআন অধ্যয়ন: সূরা ইনফিতার	৪২
বই ঃ সিরাত ইবনে হিশাম	৪৪
নভেম্বর-২১ কুরআন অধ্যয়ন: দারসুল হাদীস (অবৈধ উপার্জনের পরিনতি)	৪৬
বই ঃ সিরাত ইবনে হিশাম	৪৪
ডিসেম্বর-২১ কুরআন অধ্যয়ন: সূরা মাউন (সম্পূর্ণ)	৪৮
বই: সিরাত ইবনে হিশাম	৪৬

বি:দ্র: স্বল্প শিক্ষিত ভাই ও বোনদের জন্য স্থানীয় ভাবে বইএর সিলেবাস পরিবর্তন করে নিতে পারবেন।

বাৎসরিক আরো কিছু পড়া: ক) অর্থ সহ সম্পূর্ণ কুরআন খতম করা ১বার। খ) সিয়াহ্ সিত্তাহ্ এর যে কোন একটি গ্রন্থ সম্পূর্ণ পড়ার চেষ্টা করা। গ) সিলেবাসের মৌলিক বইগুলো বারবার অধ্যয়ন করা। ঘ) নিয়মিত বিষয় ভিত্তিক কুরআন হাদীস মুখস্ত করা। ঙ) কুরআনের ভাষায় কুরআন বুঝতে চেষ্টা করা।
প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে : ১। নিয়মিত কুরআন-হাদীসের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা। ২। জ্ঞানের ক্ষেত্রে নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তোলা। ৩। যে কোন ত্যাগ-কুরবানী ও ঈমানী অগিড়বপরীক্ষা নিজেকে মজবুত করে ধরে রাখা। ৪। সর্ববস্থায় ময়দানে থাকা, ভোট কেন্দ্র ভিত্তিক কর্মী তৈরীতে মনোযোগী হওয়া। ৫। সংগঠন ও জনশক্তি পরিচালনায় দক্ষতার পরিচয় দেওয়া। ৬। নিজেকে একজন আদর্শ মুসলীম হিসাবে তৈরী করা। ৭। দাওয়াতী কাজের ক্ষেত্রে সকলপ্রকার জড়তা দূর করা। ৮। অর্থ কুরবানীতে আরো মনযোগী ও উৎসাহিত হওয়া। ৯। ব্যক্তি জীবনে নিয়মিত এহতেসাব ও তওবার আমল গুরুত্বের সাথে জারী রাখা। ১০। সামাজিক সকল কর্মকান্ডে নিজেকে জড়িত করা ও সামাজিক ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। ১১। পড়া নিজে তৈরী করতে হবে পাশাপাশি কর্মীদেরকে এ পড়া শিখাতে হবে এবং সদস্য মানে উনিড়বত করতে হবে প্রত্যেক সদস্য বৎসরে অন্তত দুইজনকে। ১২। মাগফিরাতের জন্য, সৎগুনাবলী বিকাশের জন্য, আন্দোলনের উনড়বতির জন্য, যালিমের যুলুম থেকে রক্ষার জন্য সদা সর্বদা রাব্বুল আ'লামীনের দরবারে তাঁরি শেখানো ও নবী পাকের শেখানো ভাষায় দোয়া করা এবং সাহায্যের জন্য স্বীয় হস্তদ্বয় প্রসারিত রাখায় অভ্যস্ত হওয়া।

প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে শরিয়তী ওজর ব্যতিত অনুপস্থিত থাকা যাবেনা। প্রত্যেক সদস্য/সদস্যাকে দায়িত্বশীলের ভুমিকা পালন করতে হবে।
আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের তৌফিক দান করুন। আমিন

মার্চ-২১

কুরআন অধ্যয়ন: সূরা হুজুরাত ১ম রুকু

☞সূরা আল হুজরাত, ১-১৩ নং আয়াত:-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تُقَدِّمُوۡا بَيۡنَ يَدَىِ اللّٰهِ وَ رَسُوۡلِهٖ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ ﴿۱﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَرۡفَعُوۡۤا
اَصۡوَاتَكُمۡ فَوۡقَ صَوۡتِ النَّبِىِّ وَ لَا تَجۡهَرُوۡا لَهٗ بِالۡقَوۡلِ كَجَهۡرِ بَعۡضِكُمۡ لِبَعۡضٍ اَنۡ تَحۡبَطَ اَعۡمَالُكُمۡ وَ اَنۡتُمۡ لَا تَشۡعُرُوۡنَ ﴿۲﴾
اِنَّ الَّذِيۡنَ يَغُضُّوۡنَ اَصۡوَاتَهُمۡ عِنۡدَ رَسُوۡلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيۡنَ امۡتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوۡبَهُمۡ لِلتَّقۡوٰى ؕ لَهُمۡ مَّغۡفِرَةٌ وَّ اَجۡرٌ عَظِيۡمٌ
﴿۳﴾ اِنَّ الَّذِيۡنَ يُنَادُوۡنَكَ مِنۡ وَّرَآءِ الۡحُجُرٰتِ اَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡقِلُوۡنَ ﴿۴﴾ وَ لَوۡ اَنَّهُمۡ صَبَرُوۡا حَتّٰى تَخۡرُجَ اِلَيۡهِمۡ لَكَانَ خَيۡرًا
لَّهُمۡ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ﴿۵﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنۡ جَآءَكُمۡ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوۡۤا اَنۡ تُصِيۡبُوۡا قَوۡمًۢا بِجَهَالَةٍ فَتُصۡبِحُوۡا عَلٰى
مَا فَعَلۡتُمۡ نٰدِمِيۡنَ ﴿۶﴾ وَ اعۡلَمُوۡۤا اَنَّ فِيۡكُمۡ رَسُوۡلَ اللّٰهِ ؕ لَوۡ يُطِيۡعُكُمۡ فِىۡ كَثِيۡرٍ مِّنَ الۡاَمۡرِ لَعَنِتُّمۡ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيۡكُمُ
الۡاِيۡمَانَ وَ زَيَّنَهٗ فِىۡ قُلُوۡبِكُمۡ وَ كَرَّهَ اِلَيۡكُمُ الۡكُفۡرَ وَ الۡفُسُوۡقَ وَ الۡعِصۡيَانَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوۡنَ ۙ﴿۷﴾ فَضۡلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ
نِعۡمَةً ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيۡمٌ حَكِيۡمٌ ﴿۸﴾ وَ اِنۡ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ اقۡتَتَلُوۡا فَاَصۡلِحُوۡا بَيۡنَهُمَا ۚ فَاِنۡۢ بَغَتۡ اِحۡدٰىهُمَا عَلَى الۡاُخۡرٰى
فَقَاتِلُوا الَّتِىۡ تَبۡغِىۡ حَتّٰى تَفِىۡٓءَ اِلٰۤى اَمۡرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنۡ فَآءَتۡ فَاَصۡلِحُوۡا بَيۡنَهُمَا بِالۡعَدۡلِ وَ اَقۡسِطُوۡا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الۡمُقۡسِطِيۡنَ
﴿۹﴾ اِنَّمَا الۡمُؤۡمِنُوۡنَ اِخۡوَةٌ فَاَصۡلِحُوۡا بَيۡنَ اَخَوَيۡكُمۡ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُوۡنَ ﴿۱۰﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا يَسۡخَرۡ
قَوۡمٌ مِّنۡ قَوۡمٍ عَسٰۤى اَنۡ يَّكُوۡنُوۡا خَيۡرًا مِّنۡهُمۡ وَ لَا نِسَآءٌ مِّنۡ نِّسَآءٍ عَسٰۤى اَنۡ يَّكُنَّ خَيۡرًا مِّنۡهُنَّ ۚ وَ لَا تَلۡمِزُوۡۤا اَنۡفُسَكُمۡ وَ لَا
تَنَابَزُوۡا بِالۡاَلۡقَابِ ؕ بِئۡسَ الِاسۡمُ الۡفُسُوۡقُ بَعۡدَ الۡاِيۡمَانِ ۚ وَ مَنۡ لَّمۡ يَتُبۡ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوۡنَ ﴿۱۱﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا
اجۡتَنِبُوۡا كَثِيۡرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعۡضَ الظَّنِّ اِثۡمٌ وَّ لَا تَجَسَّسُوۡا وَ لَا يَغۡتَبۡ بَّعۡضُكُمۡ بَعۡضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمۡ اَنۡ يَّاۡكُلَ لَحۡمَ
اَخِيۡهِ مَيۡتًا فَكَرِهۡتُمُوۡهُ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيۡمٌ ﴿۱۲﴾ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقۡنٰكُمۡ مِّنۡ ذَكَرٍ وَّ اُنۡثٰى وَ جَعَلۡنٰكُمۡ
شُعُوۡبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوۡا ؕ اِنَّ اَكۡرَمَكُمۡ عِنۡدَ اللّٰهِ اَتۡقٰكُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيۡمٌ خَبِيۡرٌ ﴿۱۳﴾

☞বঙ্গানুবাদঃ

১. মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের চেয়ে অগ্রগামী হয়োনা এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন।
২. হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের আওয়াজ রাসূলের আওয়াজের চেয়ে উচু করোনা এবং উচ্চস্বরে নবীর সাথে কথা বলোনা যেরুপ তোমরা নিজেরা পরস্পর বলে থাকো। এমন যেন না হয় যে; তোমাদের অজান্তেই তোমাদের সব কাজকর্ম ধ্বংস হয়ে যায়।
৩. যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে তাদের কণ্ঠ নিচু রাখে তারাই সে সব লোক আল্লাহ যাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য বাছাই করে নিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।
৪. হে নবী, যারা আপনাকে ঘরের বাইরে থেকে ডাকাডাকি করতে থাকে তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।
৫. যদি তারা আপনার বের হয়ে আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারন করত তবে তাদের জন্য মঙ্গলজনক হতো। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।
৬. হে ঈমানদারগণ, যদি কোন ফাসেক তোমাদের কাছে কোন খবর নিয়ে আসে তাহলে তা অনুসন্ধান করে দেখ। এমন যেন না হয় যে, না জেনে শুনেই তোমরা কোন গোষ্ঠীর ক্ষতি করে বসবে এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে।
৭. ভালো করে জেনে রাখ আল্লাহর রাসূল তোমাদের মাঝে রয়েছেন। তিনি যদি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তোমাদের কতা মেনে নেন তবে তোমরাই অনেক সমস্যার মধ্যে পড়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ঈমানের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা তোমাদের কাছে পছন্দনীয় করে দিয়েছেণ। পক্ষান্তরে কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে ঘৃনিত করে দিয়েছেন।
৮. আল্লাহর দয়া ও মেহেরবাণীতে এসব লোকই সৎপথের অনুগামী। আল্লাহ জ্ঞানী ও কুশলী।
৯. যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দিবে এবং ইনছাফ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ইনছাফকারীদেরকে পছন্দ করেন।

১০. মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে-যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।
১১. মুমিনগণ, কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাদের মন্দ নামে ডাকা গোনাহ। যারা এহেন কাজ থেকে তওবা না করে তারাই যালেম।
১২. মুমিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ। এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তারা মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।
১৩. হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।

☞**নামকরণঃ ৪র্থ আয়াত থেকে গৃহীত।**

☞**নাযিল হওয়ার সময়কালঃ** বিভিন্ন বর্ণনা ও সুরার বিষয়বস্তু থেকে বোঝা যায় এ সুরা বিভিন্ন পরিবেশ ও ক্ষেত্র নাযিল হওয়া হুকুম আহকাম ও নির্দেশ সমূহের সমষ্টি। বিষয়বস্তু সাদৃশ্যের কারনে এগুলোকে এখানে একত্রিত করা হয়েছে।

৪র্থ আয়াত সম্পকে ঘটনা :

একবার বনী তামিম গোত্রের কিছু লোক রাসূল (সা:) এর নিকট উপস্থিত হয়। এই গোত্রের শাসনকর্তা নিয়োগ সম্পর্কিত আলোচনা চলছিল। হযরত আবু বকর (রা:) রা'কা ইবনে হাকিমের নাম এবং হযরত উমর (রা:) আকরা ইবনে হাফসের নাম প্রস্তাব করেন। হযরত আবু বকর (রা:) এবং হযরত উমর (রা:) এর মধে¨ চলমান এ আলোচনা এক পর্যায়ে কথা কাটাকাটিতে উন্নীত হয়ে উভয়ের কণ্ঠস্বর উচু হয়ে যায় (বুখারী)।
হিজরী ৯ম সন এ প্রতিনিধি দলের আগমনের সময়। আলোচ্য আয়াতসমূহের অবতরণ সম্পর্কে কুরতুযীর ভাষ্য অনুযায়ী ৬টি ঘটনা বর্ণিত আছে। সব ঘটনা নির্ভুল।

৬ষ্ঠ আয়াত সম্পর্কে ঘটনাঃ

মুসনাদে আহমাদের বরাত দিয়ে ইবনে কাসীর :
বনী মুস্তালিক গোত্রের সরদার হারেস ইবনে মেরাব ইসলাম গ্রহণের পর রাসুল (সা:) তাকে যাকাত প্রদানের আদেশ দিলেন। তিনি যাকাত প্রদানে স্বীকৃত হলেন এবং তারা গোত্রে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে তাদের যাকাত আদায় করে জমা করে রাখবেন বললেন এবং রাসূল (সা:) কে একটি নিদিষ্ট তারিখে যাকাতের অর্থ নেবার জন্য কোন দুত পাঠাতে বললেন। কিন্তু নির্ধারিত তারিখ পার হয়ে গেলেও দুতের দেখা না পেয়ে হারেস আশংকা করলেন রাসূল (সা:) কোন কারনে তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং একথা তিনি ইসলাম গ্রহনকারী নেতৃস্থানীয় লোকদের কাছে প্রকাশ করে রাসূল (সা:) এর সাথে সবাই মিলে দেখা করার ইচ্ছা করলেন। এদিকে রাসূল নির্ধারিত তারিখে ওলীদ ইবনে ওকবা কে প্রেরণ করলেও তিনি পথিমধ্যে ধারনা করেন এই গোত্রের লোকদের সাথে তার পুরাতন শত্র"তা আছে। তাকে একা পেয়ে হত্যা না করে ফেলে। তিনি ফিরে আসেন এবং রাসূল (সা:) কে বলেন তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে এবং আমাকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছে। রাসূল (সা:) রাগান্বিত হয়ে খালিদ ইবনে ওলীদের নেতৃত্বে একদল মুজাহিদ প্রেরণ করেন। অত:পর তা জানতে পেরে হারেস রাসূল (সা:) কে বলেন তিনি ওলীদকে দেখেনইনি।
কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে - ওলীদ ইবনে ওকবা (রা:) নির্দেশ অনুযায়ী বনু মুস্তালিক গোত্রে পৌছেন। গোত্রের লোকেরা অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে বস্তি থেকে বের হয়ে আসে। ওলীদ সন্দেহ করে তারা বোধ হয় পুরাতন শক্রুতার কারনে তাকে হত্যা করতে আসছে। তিনি সেখান থেকে ফিরে এসে এ ধারনা ব্যক্ত করলে রাসূল (সা:) খালিদ ইবনে ওলীদ কে ঘটনা পর্যবেক্ষনের নির্দেশ দিলেন। তিনি ফিরে এসে সংবাদ দিলেন তারা ঈমানের উপর অটল রয়েছে/যাকাত দিতে প্রস্তুত। ওলীদ ইবনে উকবা মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হয়েছিলেন। তাই এটি স্পষ্ট যে এ যুগের বেশীর ভাগ অংশই মাদানী যুগের শেষ পর্যায়ে নাজিলকৃত।

☞আলোচ্য বিষয়ঃ

এ সুরার বিষয়বস্তু হলো মুসলমানদেরকে এমন আদব-কায়দা, শিষ্টাচার ও আচরন শিক্ষা দেয়া যা তাদের ঈমানসুলভ স্বভাব-চরিত্র ও ভাবমূর্তির উপযুক্ত ও মানানসই।

প্রথম পাঁচ আয়াতে আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে আদব কায়দা শিক্ষা দেয়া হয়েছে।
এরপর নির্দেশ দেয়া হয়েছে প্রতিটি খবর বিশ্বাস করা এবং সে অনুযায়ী কর্মকান্ড করে বসা ঠিক নয়।
মুসলমানদের দুটি দল যদি কোন সময় সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে সে ক্ষেত্রে অন্য মুসলমানদের কর্মনীতি।
মুসলমানদেরকে কিছু খারাপ বিষয় থেকে আত্নরক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে-

★একে অপরকে ঠাট্রা-বিদ্রুপ করা

★বদনাম উপহাস করা

★উপনামে ডাকা

★গোপন বিষয় খোজাখুজি

সবশেষে বলা হয়েছে- ঈমানের মৌখিক দাবী প্রকৃত জিনিস নয় বরং সরল মনে আল্লাহ ও রাসূলকে মানা, কার্যত অনুগত থাকা এবং কুরবানী।

১. প্রথম আদবঃ আল্লাহ ও রাসূলের চেয়ে অগ্রগামী না হওয়া। এটা ঈমানের প্রাথমিক ও মৌলিক দাবী।

নিজের মতামত ও ধ্যান ধারনাকে আল্লাহ রাসূলের সিদ্ধান্তের চেয়ে অগ্রাধিকার দিতে পারেনা এবং বিভিন্ন ব্যাপারে স্বাধীন মতামত পোষন করতে পারেনা।

সুরা আহযাবের ৩৬ আয়াতে এরুপ নির্দেশ আল্লাহ ও তার রাসূল যে বিষয়ে ফয়সালা করে দিয়েছেন সে বিষয়ে আলাদা কোন ফয়সালা করার ইখতিয়ার কোন ঈমানদারের জন্য আর অবশিষ্ট থাকে না।

এ নির্দেশটি শুধু ব্যক্তিগত নয় বরং মুসলমানদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য (সরকার, বিচারালয়, পার্লামেন্ট) সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসঃ

মুয়ায ইবনে জাবালকে ইয়েমেনের বিচারক করে পাঠানোর সময় নবী (সা:) তাকে জিজ্ঞেস করলেন "তুমি কিসের ভিত্তিতে ফয়সালা করবে?" তিনি বললেন- "আল্লাহ কিতাব অনুসারে।" নবী (সা:) বললেন যদি কিতাবে না পাওয়া যায় তিনি জবাব দিলেন আল্লাহ রাসূলের সুন্নাতের সাহায্য নেব? নবী (সা:) বললেন যদি সেখানে না পাও তিনি জবাব দিলেন তাহলে আমি নিজে ইজতেহাদ করব। তাই আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাবই সর্বপ্রথম উৎস এবং তারপরই হাদীসের স্থান। এবং এক্ষেত্রে নিজেদের মতামতকে প্রাধান্য দিলে বোঝাপড়া হবে আল্লাহর সাথে।

২. যারা রাসূল (সা:) এর মজলিশে যাতায়াত করত তাদেরকে এ আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্যে তার সাথে কথা বলার সময় যেন তার মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়।

এক্ষেত্রে যখনই নবী (সা:) এর আলোচনা করা হয় এবং তার হাদীস বর্ণনা করা হয় তখন পরবর্তী সময়ের লোকদের অনুরুপে শিষ্টতা বজায় রাখা দরকার

এছাড়া নিজের চাইতে উচ্চ মর্যাদার লোকদের সাথে কথা বলার শিষ্টতা এখানে শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

ইসলামে রাসূলের ব্যক্তিসত্ত্বার মর্যাদা এ আয়াত থেকে বোঝা যায়। রাসূলের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে সামান্য শিথিলতায় সারা জীবনের সঞ্চিত পুজি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। নবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা না করা মূলত আল্লাহর প্রতি করা না করার পর্যায়ভুক্ত।

৩. অর্থ্যাৎ যে হৃদয়ে রাসূলের মর্যাদা নেই সে হৃদয়ে তাকওয়া থাকতে পারেনা। যারা বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তারা রাসূলের প্রতি তাদের পক্ষ থেকে যথাযথ মর্যাদা প্রদর্শন করে।

৪. আরবের সে পরিবেশে যেখানে সাধারন ভাবে মানুষ কোন প্রকার শিষ্টাচারের শিক্ষা পায়নি তাদের অনেকেই সময়ে সময়ে রাসূলের সাথে সাক্ষাতের জন্য হাজির হতো তার হুজরার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বাইরে থেকেই তাকে ডাকতো। স্বভাবগত কারনেই রাসূল (সা:) এসব সহ্য করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলেন।

৫. অর্থাৎ চিৎকার না করে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলে রাসূল নিজেই এসে তাদের সাথে সাক্ষাত করতেন। এ আয়াতে এ ভুলের পুনরাবৃত্তি না করার জন্য তাগিদ দিয়েছেন।

৬. অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে এটি ওলীদ ইবনে ওকবা ইবনে আবা মুআ'ইত সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

-হারেস ইবনে মেরার (উম্মুখ মুমিনিন হযরত জুয়াইরিয়ার পিতা) এক প্রতিনিধি দল নিয়ে রাসূলের দরবারে হাযির হন। হযরত উম্মে সালামা বর্ণিত হাদীসে পুরো ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইসলামের নাজুক পরিস্থিতিতে যখন একটি ভিত্তিহীন সংবাদকে কেন্দ্র করে এত বড় ভুল সংঘটিত হতে যাচ্ছিল সে মুহুর্তে আল্লাহ এ মৌলিক নির্দেশ দিলেন যে, যখন এমন কোন খবর পাওয়া যাবে যার ভিত্তিতে বড় রকমের কোন ঘটনা সংঘটিত হতে পারে তখন তা বিশ্বাস করার পূর্বে বার্তাবাহক কেমন ব্যক্তি তা যাচাই করতে হবে।

-যার বাহ্যিক অবস্থা দেখেই প্রতীয়মান হয় যে বার্তাবাহক নির্ভরযোগ্য নয় (ফাসেক) তবে প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী কাজ করার পূর্বে তা যাচাই করা দরকার।

-যার চরিত্র ও কর্ম নির্ভরযোগ্য নয় এমন কোন সংবাদদাতার সংবাদের উপর ভিত্তি করে কোন, ব্যক্তি, জাতি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা ইসলামী সরকারের জন্য বৈধ নয়।

-হাদীস শাস্ত্রবিদগণ এ প্রেক্ষিতে 'জারহ ও তা'দীল' এর নীতি উদ্ভাবন করেছেন। যাতে যাদের মাধ্যমে নবী (সা:) এর হাদীস পরবর্তী বংশধরদের নিকট পৌছেছিল তাদের অবস্থা যাচাই করা যায়।

-তাছাড়া সাক্ষ্য আইনের ক্ষেত্রে নীতি হলো এমন কোন ব্যাপারে ফাসেক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহনযোগ্য হবেনা যা দ্বারা শরীয়তের কোন নির্দেশ প্রমানিত হয় কিংবা কোন মানুষের উপর কোন অধিকার বর্তায়। তবে সাধারন পার্থিব ব্যাপারে প্রতিটি খবর অনুসন্ধান এবং সংবাদাতার নির্ভরযোগ্যতা জরুরী নয়। কারন আয়াতে গুরুত্বপূর্ণ খবর বলা হয়েছে।

৭. বন্ধু মুসতালিক গোত্র সম্পর্কে ওয়ালীদ ইবনে উকবার খবরের ভিত্তিতে নবী (সা:) তাদের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহন করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। কিন্তু কিছু সাহাবী তৎক্ষনাৎ তাদের বিরুদ্ধে আক্রমন করার জন্য নবী (সা:) কে পীড়াপীড়ি করছিল। এ প্রেক্ষিতে এই আয়াত।

৮. অর্থ্যাৎ কতিপয় লোক তাদের অপরিপক্ক সিদ্ধান্ত জানালেও মুসলমানদের গোটা জামায়াত ভুল করেনি। মুমিনদের সঠিক পথের উপর কায়েম থাকার কারন হচ্ছে আল্লাহ তার দয়া ও মেহেরবানীতে ঈমানী আচরনকে তাদের জন্য প্রিয় ও হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন এবং নাফরমানী আচরনকে ঘৃনিত করে দিয়েছেন। আয়াতের দুটি অংশে দুটি ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। "যারা বনু মুসতালিকের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য পীড়াপীড়া করছিল তাদের কথা বলা হয়েছে।" কথা বলা হয়েছে যারা নিজেদের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করেনি। বরং ঈমানের দাবীর উপর ছিলেন। তবে তারা ঈমানের প্রতি অটল ছিলনা একথা বলা হয়নি, বরং শিথিলতার কথা বলা হয়েছে। তাই তিনি (আল্লাহ) প্রথমে এর ভুল ও কুফল তুলে ধরেছেন।

৯. আল্লাহর অনুগ্রহ ও মেহেরবানী কোন ভাগ বাটোয়ারা নয়। তিনি এ বিরাট নেয়ামত জ্ঞান যুক্তির ভিত্তিতে দান করেন।

☞ব্যাখ্যাঃ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

১. হে ঐ সব লোক, যারা ঈমান এনেছো। তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূল থেকে এগিয়ে যেও না। আর আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ সব কিছু শুনেন ও জানেন।

· لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের চেয়ে অগ্রগামী হয়ো না।

– ঈমানের প্রথম ও মৌলিক দাবী হচ্ছেঃ যে আল্লাহকে নিজের মালিক হিসাবে মানে এবং রাসূল সা.কে জান্নাতের পথ প্রদর্শক হিসাবে গ্রহণ করে, তাহলে তাকে তার এই ঈমানের উপর সত্যবাদীতা প্রমাণ করতে হবে এই ভাবে যে,
ক. নিজ মতামত ও ধ্যান-ধারণাকে কখনো আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের সিদ্ধান্তের চেয়ে অগ্রাধিকার দেবে না।
খ. বিভিন্ন ব্যাপারে স্বাধীন মতামত পোষণ করতে পারবে না।
গ. সিদ্ধান্ত গ্রহণে সব সময় আগে দেখে নেবে যে, এই ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ কি।

– لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ -" আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অগ্রগামী হয়ো না।" মানেঃ
- তার আগে আগে চলবে না। পেছনে পেছনে চলো। - তার আনুগত্য হয়ে থাকো।
- নির্দেশদাতা হয়োনা, আনুগত্যকারী হও।

- সূরা আহযাবে একই কথা বলা হয়েছে একটু নরম ভাবেঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

যখন আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোনো বিষয়ের ফায়সালা দিয়ে দেন তখ কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর সেই ব্যাপারে নিজে ফায়সালা করার কোনো অধিকার নেই। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করে সে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হয়। (আয়াতঃ ৩৬)
– অর্থাৎ ঈমানদার নিজেদের ব্যাপারে কখনো আপনা থেকে অগ্রগামী হয়ে কোন বিষয় ফায়সালা করবেনা। বরং তার দেখা উচিত যে, সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে আল্লাহর কিতাব বা রাসূলের সুন্নাহতে কি নির্দেশনা রয়েছে।
– এটি ইসলামী আইনের একটি মৌলিক দফা। অগ্রগামী না হওয়ার এই নির্দেশ কেবল ব্যক্তিগত ব্যাপারে নয়, বরং সামাজিক ব্যাপারেও প্রযোজ্য। প্রযোজ্য সরকার, বিচারালয় এবং পার্লামেন্ট সব কিছুতে।
– মুয়াজ বিন জাবল (রা.) কে যখন ইয়ামানের শাসনকর্তা নিয়োগ করে পাঠানো হয়ে, তখন নবী সা প্রশ্ন করেছিলেনঃ তুমি কিসের ভিত্তিতে ফায়সালা করবে? তিনি জবাব দিলেনঃ "আল্লাহর কিতাব অনুসারে" । নবী (সা.) বললেনঃ যদি কোন বিষয়ে কিতাবুল্লাহর মধ্যে হুকুম না পাওয়া যায় তাহলে কোন জিনিসের সাহায্য নেবে? তিনি জবাব দিলেন , আল্লাহর রসূলের সুন্নাতের সাহায্য নেব। তিনি বললেনঃ যদি সেখানেও কিছু না পাও? তিনি বললেনঃ তাহলে আমি নিজে ইজতিহাদ করবো। একথা শুনে নবী (সা.) তার বুকের ওপর হাত রেখে বললেনঃ সে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করছি যিনি তাঁর রসূলের প্রতিনিধিকে এমন পন্থা অবলম্বন করার তাওফীক দান করেছেন যা তার রসূলের কাছে পছন্দনীয়।
– মুসলিম বিচারক আর অমুসলিম বিচারকের মধ্যকার মূল পার্থক্য তুলে ধরে এমন বস্তু হচ্ছেঃ নিজের ইজতিহাদের চেয়ে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতকে অগ্রাধিকার দেয়া এবং হিদায়াত লাভের জন্য সর্বপ্রথম এ দুটি উৎসবের দিকে ফিরে যাওয়া
– আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাবই যে সর্বপ্রথম উৎস এবং তারপরই যে রসূলের সুন্নাত- এ ব্যাপারে চূড়ান্ত ঐকমত্য প্রতিষ্ঠীত, ব্যক্তির কিয়াস ও ইজতিহাদ তো দূরের কথা গোটা উম্মতের ইজমাও এ দুটি উৎসের পরিপন্থী কিংবা তা থেকে স্বাধীন হতে পারে না।

– নবী (সাঃ) হযরত যায়েদের (রা.) জন্য হযরত যয়নবের (রা.) সাথে বিয়ের পয়গাম দিয়েছিলেন এবং হযরত যয়নব ও তার আত্মীয়রা তা নামঞ্জুর করেছিলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী (সাঃ) যখন এ পয়গাম দেন তখন হযরত যয়নব (রা.) বলেনঃ أنا خير منه "আমি বংশীয় দিক দিয়ে তার থেকে উত্তম" لا أرضاه لنفسي وأنا أيم قريش "আমি অভিজাত কুরাইশ পরিবারের মেয়ে, তাই আমি তাকে নিজের জন্য পছন্দ করি না।" তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইবনে জাহশও (রা) এ ধরনের অসম্মতি প্রকাশ করেছিলেন এর কারণ ছিল এই যে, হযরত যায়েদ নবী (সাঃ) এর আযাদ করা গোলাম ছিলেন এবং হযরত যয়নব ছিলেন তাঁর ফুফু (উমাইমাহ বিনতে আবদুল মুত্তালিব)-এর কণ্যা। এত উঁচু ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে, তাও আবার যা তা পরিবার নয়, নবীর নিজের ফুফাত বোন এবং তার বিয়ের পয়গাম তিনি দিচ্ছিলেন নিজের আযাদ করা গোলামের সাথে একথা তাদের কাছে অত্যন্ত খারাপ লাগছিল। এ অবস্থায় এ আয়াত নাযিল হয়। এ আয়াত শুনতেই হযরত যয়নব ও তাঁর পরিবারের সবাই নির্দ্বিধায় আনুগত্যের শির নত করেন। এরপর নবী (সাঃ) তাদের বিয়ে পড়ান। তিনি নিজে হযরত যায়েদের (রা.) পক্ষ থেকে ১০ দীনার ও ৬০ দিরহাম মোহরানা আদায় করেন, কনের কাপড় চোপড় দেন এবং কিছু খাবার দাবারের জিনিসপত্র পাঠান।

- وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ **আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।**

- অর্থাৎ ঃ এই নির্দেশনার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। যদি তোমরা কখন এই নির্দেশনাকে উপেক্ষা করে মুক্ত ও স্বেচ্ছাচারী হওয়ার নীত গ্রহণ করো কিংবা নিজ মতামতকে অগ্রাধিকার দাও। তাহলে মনে রেখো, আল্লাহ দেখছেন-তিনি বুঝাপড়া করবেন।

- একদিন রাসূল (সা.) আবু দারদা (রাঃ) কে আবু বকর (রাঃ) এর অগ্রে চলতে দেখে সর্তক করে বললেনঃ তুমি কি এমন ব্যক্তির অগ্রে চল যিনি ইহকাল ও পরকালে তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ? তিনি আরও বললেনঃ দুনিয়াতে এমন কোন ব্যক্তির উপর সুর্যোদয় ও সুর্যাস্ত হয়নি যে পয়গম্বরদের পর হযরত আবু বকর থেকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। (রুহুল বয়ান)

- **আমরা কি করি?**

- আমরা দ্বীনের জন্য লম্বা লম্বা বক্তব্য দেই। কিন্তু আমল করার বিষয় যখন আসে, তখন ভূলে যাই।

- আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশনা দেখিনা।

- আমরা খুব সামান্য সমস্যায় পড়ে রুখসতের তরিকা গ্রহণ করি।

- আমরা চাকুরীর জন্য ওয়াস্তা খোঁজি, জরিমানা মাফ করানোর জন্য ওয়াসতা খোঁজি, জাওয়াজাতের কাজ করার জন্য খরচ যা লাগবে, তা সমস্যা নয় অফার দিয়ে ওয়াস্তা খোঁজি।

- আমরা দ্বীন সম্পর্কে খুব কম জানি। অথচ আমাদের বক্তব্যে তা মনে হয়না।

- আমরা বড় বড় মাওলানাদের সমালোচনা করি। মাত্র ২/১টি বাংলা বই পড়ে আমরা মহা পন্ডিত। মনে করিঃ যাহা জানার তা কেবল আমি জানি অথবা আমাদের সংগঠনের লোকে জানে।

- আমরা ফেইসবুক চালাই মন্তব্য করি-আমার সংগঠনের দৃষ্টিভংগী দেখিনা।

- সংগঠনের সমালোচনার জবাবে আমি সমালোচনা করি। কিন্তু আমার সংগঠনে একজন জবাব দেয়ার দায়িত্বে আছেন, তা মনে রাখিনা।

- আমরা মুজিবুর রহমান মনজুর ১৪ গোষ্ঠী উদ্ধার করি। কিন্তু এ ব্যাপারে আমীরে জামায়াত বলেছেনঃ আমরা এই সম্পর্কে কোন কথা বলবো না। পক্ষেও না, বিপক্ষেও না।

- আমরা চলার সময় দায়িত্বশীলকে সামনে দেই না।

- দায়িত্বশীল রেখে আমরা মন্তব্য করা শুরু করি।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

২. হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের আওয়াজ রাসূলের আওয়াজের চেয়ে উচু করোনা এবং উচ্চস্বরে নবীর সাথে কথা বলোনা যেরুপ তোমরা নিজেরা পরস্পর বলে থাকো। এমন যেন না হয় যে; তোমাদের অজান্তেই তোমাদের সব কাজকর্ম ধ্বংস হয়ে যায়।

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ

হে মু'মিনগণ! নিজেদের আওয়ায রসূলের আওয়াযের চেয়ে উঁচু করো না এবং উচ্চস্বরে নবীর সাথে কথা বলো না, যেমন তোমরা নিজেরা পরস্পর বলে থাকো।

- এ বক্তব্যে মাধ্যমে রাসূল সা. এর মজলিসে উঠাবসা ও যাতায়াতের আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

- নবীর সাথে সাক্ষাত বা কথাবার্তার সময় নবীর স্টেটাস তথা তাঁর সম্মান ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে। যেমনঃ
ক. কারো কন্ঠ যেন নবীর কন্ঠ থেকে উচ্চ না হয়।
খ. তাকে সাধারণ মানুষের মতো এড্রেস করা যাবেনা।

- নবী এখন নাই। কিন্তু তার মজলিস আছে। তাই যে সব মাহফিলে কুরআন বা হাদীসের আলোচনা হয় তখন সেই সব মাহফিলেও এমনি আদব রক্ষা করতে হবে।

- নবীর অবর্তমানে নবীর কাজ যারা করছেন, তাদের মধ্যে যারা নবীর আন্দোলনের দায়িত্বশীল, তাদের সাথে আচরণ কিভাবে হবে, এই আয়াতে সে হেদায়াত দেয়া হয়েছে।

- সম্মানিত লোকের সাথে কিভাবে কথা বলতে হবে, তার নসিহত এখানে পাওয়া যায়।

· أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ-এমন যেন না হয় যে, তোমাদের অজান্তেই তোমাদের সব কাজ-কর্ম ধ্বংস হয়ে যায়।

- আয়াতের এই অংশে রাসূল সা. এর ব্যক্তিসত্তার মর্যাদা ও অবস্থান উপস্থাপিত হয়েছে।

- দুনিয়াতে যত সম্মাণিত লোক হোক, তার সাথে বেয়াদবী যেমন কুফুরী হবে না, তেমনি শাস্তি যোগ্য হবেনা। কিন্তু রাসূলের সাথে বেয়াদবী শাস্তিযোগ্য অপরাধ ও যা কুফুরী এবং গোনাহ।

- রাসূলের প্রতি সম্মাণ প্রদর্শনে অবহেলা, আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে অবহেলার পর্যায়ভূক্ত।

- ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীলদের প্রতি অসম্মাণও একই পর্যায়ে পড়ে।

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

৩. যারা আল্লাহর রাসূলের সাথে কথা বলার সময় নিজেদের আওয়াজ নিচু রাখে, তারা আসলে ঐসব লোক, আল্লাহ যাদের অন্তর তাকওয়ার জন্য যাচাই করে নিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও মহান বদলা।

· إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ যারা আল্লাহর রসূলের সামনে তাদের কণ্ঠ নিচু রাখে তারাই সেসব লোক, আল্লাহ যাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য বাছাই করে নিয়েছেন।

- মানেঃ

** আল্লাহ ও তার রাসূলের সম্মাণের প্রতি তারাই লক্ষ রাখবে, যারা আল্লাহর পরীক্ষায় পাস করেছে। পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ দিয়েছে যে, তাদের অন্তরে তাকওয়া রয়েছে।

** যে দিলের মাঝে রাসূলের জন্য মর্যাদাবোধ নাই, সে দিলে তাকওয়া নাই।

** রাসূলের সামনে বড় গলায় কথা বলাঃ অন্তরে তাকওয়া না থাকার প্রমাণ।

** দায়িত্বশীলের সামনে বড় গলায় কথা বলাঃ অন্তরে তাকওয়া না থাকার প্রমাণ।

· لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ তাদের রয়েছে ক্ষমা ও বড় পুরস্কার।

· এ ব্যাপারে একটা কাহিনী আছেঃ একবার বনী তামিম গোত্রের কিছু লোক রাসূল (সা.) এর নিকট উপস্থিত হয়। এই গোত্রের শাসনকর্তা নিয়োগ সম্পর্কিত আলোচনা চলছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) রা'কা ইবনে হাকিমের নাম এবং হযরত উমর (রাঃ) আকরা ইবনে হাফসের নাম প্রস্তাব করেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত উমর (রাঃ) এর মধ্যে চলমান এ আলোচনা এক পর্যায়ে কথা কাটাকাটিতে উন্নীত হয়ে উভয়ের কণ্ঠস্বর উচু হয়ে যায়। (বুখারী)

· **উচ্চ স্বরে কথা না বলা প্রসংগেঃ**

** এ আয়াত নাযিলের পর হযরত আবুবকর (রাঃ) আরজ করলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ আল্লাহর কসম! এখন মৃত্যু পর্যন্ত আপনার সাথে কানাকানির অনুরুপে কথা বলব। (বায়হাকী)

** হযরত উমর (রাঃ) এরপর থেকে এত আস্তে কথা বলতেন যে, প্রায়ই পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হতো। (সেহাহ)

** হযরত সাবেত ইবনে কায়সের কণ্ঠস্বর স্বভাবগতভাবেই উচু ছিল। এ আয়াত নাযিলের পর তিনি ভয়ে সংযত হলেন এবং কণ্ঠস্বর নিচু করলেন। (দুররে মনসুর)

** কাযী আবু বকর ইবনে আরাবী (রহঃ) বলেন রাসূল (সা.) এর সম্মান ও আদব তার ওফাতের পরও জীবদ্দশার ন্যায় ওয়াজিব।

** কোন কোন আলেম বলেন তার কবরের সামনে উচ্চস্বরে কথা বরা আদবের খেলাফ। যে মজলিসে হাদীস পাঠ হয় সেখানে হট্টগোল করা বে-আদবী।

** কণ্ঠস্বর উচু করলে আমল বিনষ্ট হবে কেন? সৎকর্ম বিনষ্ট করাঃ ১) কুফরী ২) ঈমান ইচ্ছাধীন কাজ কুফরীও ইচ্ছাধীন কাজ।

** কিন্তু আয়াতে বলা হয়েছে। সুতরাং এখানে কুফরীর শাস্তি কিভাবে হতে পারে। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) তার বায়ানুল কুরআনে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন রাসূলের কণ্ঠ থেকে উচু হলে বিনষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে কারন রাসূল কষ্ট পাবেন।

· **আমরা কি করি?**

** দায়িত্বশীলদের যে একটা শরয়ী মর্যাদা আছে, তা আমরা ভূলে যাই।

** বৈঠকে কথা বলা আমার অধিকার মনে করি-তাই যেমন খুশী তেমন বলি।

** আমিরে জামায়াতের নসিহত হচ্ছেঃ আমরা অধিকারের কথা ভূলে যেতে হবে, দায়িত্বের কথা স্মরণে রাখতে হবে।

** আমরা বৈঠকে অনুমতি ছাড়া কথা বলি।

** একজন কথা বলেছে, সাথে সাথে আমি জবাব দেই। অথচ আমাকে জবাব দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়নি।

** বৈঠকে আমরা দুইজন কথা বলি। আমাদেরকে কথা থামাতে হয়।

** দায়িত্বশীলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

** বৈঠকে আপনাকে কথা বলার সুযোগ দেয়া দায়িত্বশীলের কর্তব্য। সে কর্তব্য উনি পালন না করলে তার জবাবদিহি উনি করবেন। কিন্তু উনার কর্তব্য পালনে আপনি তাকে জোর করতে পারেন না।
** বৈঠকের অধিকাংশের মতামতের আলোকে দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত দেবেন। কিন্তু উনি বাধ্য নন। অধিকাংশের মত নয়, এমন সিদ্ধান্ত দেয়ার অধিকারও দায়িত্বশীলের রয়েছে। এমন অবস্থায়ও দায়িত্বশীলের আনুগত্য করতে হবে।
** কোন অবস্থায়ই দায়িত্বশীলের উপরের মুরব্বীয়ানা করা যাবেনা।
** দায়িত্বশীলের সাথে যখন কথা বলবেন, তখন হিসাব করবেনঃ কে কথা বেশী বলেছে। আপনি না দয়িত্বশীল। মনে রাখবেনঃ বলবেন কম, শুনবেন বেশী। আপনার কথা কম হতে হবে, দায়িত্বশীলের কথা বেশী হতে হবে ।

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
৪. (হে রাসূল) যারা আপনাকে হুজরার বাহির থেকে ডাকাডাকি করে তাদের বেশীর ভাগ লোকেরই কান্ডজ্ঞান নেই।
· إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ হে নবী! যারা তোমাকে গৃহের বাইরে থেকে ডাকাডাকি করতে থাকে তাদের অধিকাংশই নির্বোধ৷

এ ব্যাপারে একটা কাহিনী আছেঃ نزلت هذه الآيات الكريمة، في أناس من الأعراب، الذين وصفهم الله تعالى بالجفاء، وأنهم أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، قدموا وافدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوه في بيته وحجرات نسائه، فلم يصبروا ويتأدبوا حتى يخرج، بل نادوه: يا محمد يا محمد، [أي: اخرج إلينا]، فذمهم الله بعدم العقل، حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع رسوله واحترامه، كما أن من العقل وعلامته استعمال الأدب.

- ইমাম বগাভী (রহঃ) কাতাদাহ (রাঃ) এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন বনু তামীমের লোকগণ দুপুরের সময় মদীনায় উপস্থিত হয়েছিল। তখন রাসূল (সা.) কোন এক হুজরায় বিশ্রামরত ছিলেন। তারা ছিল বেদুঈন এবং সামাজিকতার রীতি নীতি থেকে অজ্ঞ। তারা হুজরার বাইরে থেকেই ডাকাডাকি শুরু করলঃ “হে মুহাম্মদ আমাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আসুন” (মাযহারা)

- সাহাবী ও তাবেয়ীগণ তাদের আলেমদের সাথেও অনুরুপ ব্যবহার করতেন।
- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে- আমি যখন কোন আলেম সাহাবীর কাছে থেকে কোন হাদীস লাভ করতে চাইতাম তখন তার গৃহে পৌছে ডাকাডাকি বা দরজার কড়া নাড়া থেকে বিরত থাকতাম এবং দরজার বাইরে বসে অপেক্ষা করতাম। তিনি যখন নিজেই বাইরে আসতেন তখন আমি তার নিকট হাদীস জিজ্ঞেস করতাম। তিনি দেখে বলতেন হে রাসূলুল্লাহর চাচাত ভাই আমাকে আপনি কড়া নেড়ে সংবাদ দিলেনা কেন। উত্তরে বলতাম-আল্লাহর নির্দেশ তাদের বাইরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। হযরত আবু ওবায়দা (রহঃ) বলেন আমি কোনদিন কোন আলেমের দরজায় গিয়ে কড়া নাড়া দেইনি বরং অপেক্ষা করেছি যে, তিনি নিজেই বাইরে আসলে সাক্ষাত করব। (রুহুল মা'আনী)

- শিষ্টাচার শিক্ষা দিলেন।
- হে মুহাম্মদ বলে ডাকা নয়।
- আমরা নাম ধরে না ডেকে অন্য ভাবে ডাকবো।
- কারো বাসায় গেলে, উনি বের হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। যাওয়ার আগে ফোন করে যাবেন বা আগে এপোয়েন্টম্যান্ট নিয়ে যাবেন।
- দায়িত্বশীল রোবট নন, তিনিও রক্তে মাংসে মানুষ। তারও ব্যক্তিগত সুবিধা_ অসুবিধা, চাওয়া পাওয়া, বিশ্রাম ইত্যাদির জরুরত আছে।
- আমার পাঠচক্র ও মেহমান-উনারা অবাঞ্চিত নন, কিন্তু এই সময়ের জন্য অবাঞ্চিত।
- এ্যাপোয়েন্টম্যান্ট নিয়ে হোক আর এমনি এমনি যাওয়া হোক, সর্বাবস্তায় আদব হচ্ছেঃ আপনি কারো ঘরে প্রবেশ করতে সালামের মাধ্যমে অনুমতি চাইবেন। ৩ বার সালাম দিয়েও উত্তর না পেলে ফিরে আসবেন।

- আল কুরআনের নির্দিশঃ সূরা নিসাঃ ২৭
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

- একজন সাহবীর প্রশ্নঃ মায়ের ঘরে ঢুকার আগে কি অনুমতি লাগবে?
- মায়ের ঘরে ঢুকতে অনুমতি লাগলে, বোনের ঘরে ঢুকতে অনুমতি লাগবে কিনা?
- শাশুড়ির ঘরে ঢুকতে অনুমতি লাগলে, শালীর ঘরে ঢুকতে অনুমতি লাগবে কিনা?
- আপনি দায়িত্বশীলদের বিরুদ্ধে শুধু অভিযোগ দেবেন না। যারা জীবনে ব্যর্থ, তারা অভিযোগ করে। সফল ব্যক্তিরা অভিযোগ না করে শুকরিয়া আদায় করে।
وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

৫. যদি আপনার বের হওয়া পর্যন্ত তারা সবর করে থাকতো, তাহলে সেটা তাদেরই জন্য ভাল হতো। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ
যদি তারা তোমার বেরিয়ে আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করতো তাহলে তাদের জন্য ভাল হোত ।

- নবী সা. এর সাহাবী যারা তার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল, তারাঃ
** ইসলামী আদব-কায়দা, ভদ্রতা, ও শিষ্টাচারের প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন।
** সবসময় নবীর (সা) সময়ের প্রতি লক্ষ রাখতেন। কারণ তিনি আল্লাহর কাজে কতটা ব্যস্ত জীবন যাপন করেন সে ব্যাপারে তাদের পূর্ণ উপলব্ধি ছিল।
** ক্লান্তিকর ব্যস্ততার ভেতরে কিছু সময় তার আরামের জন্য, কিছু সময় অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য এবং কিছু সময় পারিবারিক কাজকর্ম দেখা-শোনার জন্যও অবশ্যই থাকা প্রয়োজন।
** তারা নবীর সাথে দেখা করার জন্য এমন সময় গিয়ে হাজির হতো যখন তিনি ঘরের বাইরেই অবস্থান করতেন।
** তাঁকে মজলিসে না-ও পেতো তাহলে তাঁর বেরিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতো।
** অত্যাধিক প্রয়োজন ছাড়া তাঁকে বাইরে আসার জন্য কষ্ট দিতো না।

- আরবের সে পরিবেশে যেখানে সাধারণভাবে মানুষ কোন প্রকার শিষ্টাচারের শিক্ষা পায়নি সেখানে বারবার এমন সব অশিক্ষিত লোকেরা নবীর (সা) সাথে সাক্ষাতের জন্য এসে হাজির হতো যাদের ধারণা ছিলঃ
** ইসলামী আন্দোলন ও মানুষকে সংশোধনের কাজ যারা করেন তাদের কোন সময় বিশ্রাম গ্রহণের অধিকার নেই।
** রাতের বেলা বা দীনের বেলা যখনই ইচ্ছা তাঁর কাছে এসে হাজির হওয়ার অধিকার তাদের আছে।
** তাঁর কর্তব্য হচ্ছে, যখনই তারা আসবে তাদের সাক্ষাত দানের জন্য তিনি প্রস্তুত থাকবেন।

- এ প্রকৃতির লোকদের মধ্যে সাধারণভাবে এবং আরবের বিভিন্ন অংশ থেকে আগত লোকদের মধ্যে বিশেষভাবে এমন কিছু অজ্ঞ অভদ্র লোকও থাকতো যারা নবীর (সা) সাথে সাক্ষাত করতে আসলে কোন খাদেমের মাধ্যমে ভিতরে খবর দেয়ার কষ্টটাও করতো না।
- নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীদের হুজরার চারদিক ঘুরে ঘুরে বাইরে থেকেই তাঁকে ডাকতে থাকতো।সাহাবীগণ হাদীসে এ ধরনের বেশ কিছু ঘটনা বর্ণনা করেছেন।
-লোকজনের এ আচরণের রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খুব কষ্ট হতো।কিন্তু স্বভাবগত ধৈর্যের কারণে তিনি এসব সহ্য করে যাচ্ছিলেন।
- শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলেন এবং এ অবশিষ্ট কর্মনীতির জন্য তিরস্কার করে লোকজনকে এ নির্দেশনা দান করলেন যে,
** যখন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য এসে তাঁকে পাবে না, তখন চিৎকার করে তাঁকে ডাকার পরিবর্তে ধৈর্যের সাথে বসে সে সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে যখন তিনি নিজেই তাদেরকে সাক্ষাতদানের জন্য বেরিয়ে আসবেন।

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।
** ভুলের যদি পুনরাবৃত্তি না করা হয়, তবে অতীতের সকল গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন।
** আল্লাহ যে ক্ষমা করবেন, এটা আপনার আমার কৃতিত্ব নয়, বরং তার দয়া।
** অতএব, আমরা দায়িত্বশীলদের সময়সূচীকে বিবেচনায় রাখবো।
** যখন তখন কারো বাসায় যাবো না।
** আগে না জানিয়ে যাবো না।
** টেলিফোন করার সময় নজর রাখবোঃ

১. নামাযের সময় কি না?
২. ঘুমের সময় কিনা?
৩. উনি এই সময়ে সাধারণতঃ ব্যস্ত থাকেন কি না?

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

৬. হে ঐসব লোক যারা ঈমান এনেছো! যদি কোন ফাসেক লোক তোমাদের কাছে কোন খবর নিয়ে আসে, তাহলে এর সত্যতা যাচাই করে নিও। এমন যেন না হয় যে, তোমরা না যেনে কোন কাওমের ক্ষতি করে বসো এবং তারপর যা করেছো, সে জন্য আফসোস করতে থাকো।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

হে ঈমান গ্রহণকারীগণ, যদি কোন ফাসেক তোমাদের কাছে কোন খবর নিয়ে আসে তাহলে তা অনুসন্ধান করে দেখ। এমন যেন না হয় যে, না জেনে শুনেই তোমরা কোন গোষ্ঠীর ক্ষতি করে বসবে এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে।

- **এ ব্যাপারে একটা কাহিনী আছেঃ**

*** মুসনাদে আহমাদের বরাত দিয়ে তাফসীর ইবনে কাসীরঃ
** বনী মুস্তালিক গোত্রের সরদার হারেস ইবনে মেরাব ইসলাম গ্রহণের পর রাসুল (সা.) তাকে যাকাত প্রদানের আদেশ দিলেন।
** তিনি যাকাত প্রদানে স্বীকৃত হলেন এবং তারা গোত্রে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে তাদের যাকাত আদায় করে জমা করে রাখবেন বললেন।
** রাসূল (সা.) কে একটি নিদিষ্ট তারিখে যাকাতের অর্থ নেবার জন্য কোন দুত পাঠাতে বললেন।
** কিন্তু নির্ধারিত তারিখ পার হয়ে গেলেও দুতের দেখা না পেয়ে হারেস আশংকা করলেন রাসূল (সা.) কোন কারনে তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন।
** একথা তিনি ইসলাম গ্রহনকারী নেতৃস্থানীয় লোকদের কাছে প্রকাশ করে রাসূল (সা.) এর সাথে সবাই মিলে দেখা করার ইচ্ছা করলেন।
** এদিকে রাসূল নির্ধারিত তারিখে ওলীদ ইবনে ওকবা কে প্রেরণ করলেন।
** ওলীদ ইবনে ওকবা (রাঃ) নির্দেশ অনুযায়ী বনু মুস্তালিক গোত্রে পৌছেন। গোত্রের লোকেরা অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে বস্তি থেকে বের হয়ে আসে।
** ওলীদ সন্দেহ করে তারা বোধ হয় পুরাতন শত্রুতার কারণে তাকে হত্যা করতে আসছে।
** তিনি ফিরে আসেন এবং রাসূল (সা.) কে বলেন তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে এবং আমাকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছে।
** রাসূল (সা.) রাগান্বিত হয়ে খালিদ ইবনে ওলীদ কে ঘটনা পর্যবেক্ষনের নির্দেশ দিলেন।
** খালিদ ইবনে ওলীদের নেতৃত্বে একদল মুজাহিদ প্রেরণ করেন। তিনি ফিরে এসে সংবাদ দিলেন তারা ঈমানের উপর অটল রয়েছে এবং যাকাত দিতে প্রস্তুত। অতঃপর তা জানতে পেরে হারেস রাসূল (সা.) কে বলেন তিনি ওলীদকে দেখেনইনি।
** ওলীদ ইবনে উকবা মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হয়েছিলেন।তাই এটি স্পষ্ট যে এ যুগের বেশীর ভাগ অংশই মাদানী যুগের শেষ পর্যায়ে নাজিলকৃত।

- **এ আয়াত আমাদেরকে কি শিখালো?**

** বড় ধরণের ঘটনা ঘটে যেতে পারে, এমন ধরণের খবরের ক্ষেত্রে খবর প্রদানকারী ব্যক্তিকে যাচাই করে দেখতে হবে।
** খবর প্রদানকারী যদি ফাসেক হয়, তার বাহ্যিক অবস্থা দেখেই বুঝা যাবে যে, তার কথা নির্ভর যোগ্য নয়। এমন অবস্থায় প্রকৃত ঘটনা অনুসন্ধান করতে হবে।
** শরীয়ার হুকুম হচ্ছেঃ যার চরিত্র ও কর্ম নির্ভরযোগ্য নয়, এমন সংবাদদাতার সংবাদ গ্রহণ করে কোন ইসলামী সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ বৈধ নয়।
** এই নীতির ভিত্তিতে হাদীস সহীহ কি না, তা যাচাই করার জন্য হাদীস বিশারদগন "জারহ ও তা'দীল" নীতি উদ্ভাবন করেন।
** ফকীহরা নীতি গ্রহণ করেছেন যে, এমন কোন ব্যাপারে ফাসেক ব্যক্তির সাক্ষ গ্রহণযোগ্য হবে না যার দ্বারা শরীয়াতের কোন নির্দেশ প্রমাণিত হয় কিংবা কোন মানুষের ওপর কোন অধিকার বর্তায়।

পণ্ডিতগণ একমত যে, সাধারণ পার্থিব ব্যাপারে প্রতিটি খবরই যাঁচাই ও অনুসন্ধান করা এবং খবরদাতার নির্ভরযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া জরুরী নয়। সাধারণ এ খুঁটিনাটি ব্যাপারে এ নীতি খাটে না।

☞ **শিক্ষাঃ**

১) ধর্মীয় আলেমদের ক্ষেত্রে এ বিধান কার্যকর কারন তারা পয়গম্বরদের উত্তরাধিকারী।

- একদিন রাসূল (সা:) আবু দারদা (রা:) কে আবু বকর (রা:) এর অগ্রে চলতে দেখে সর্তক করে বললেন: তুমি কি এমন ব্যক্তির অগ্রে চল যিনি ইহকাল ও পরকালে তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ? তিনি আরও বললেন: দুনিয়াতে এমন কোন ব্যক্তির উপর সুর্যোদয় ও সুর্যাস্ত হয়নি যে পয়গম্বরদের পর হযরত আবু বকর থেকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। (রুহুল বয়ান)

২) উচ্চ স্বরে কথা না বলাঃ

এ আয়াত নাযিলের পর

- হযরত আবুবকর (রা:) আরজ করলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ আল্লাহর কসম! এখন মৃত্যু পর্যন্ত আপনার সাথে কানাকানির অনুরুপে কথা বলব। (বায়হাকী)
- হযরত উমর (রা:) এরপর থেকে এত আস্তে কথা বলতেন যে, প্রায়ই পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হতো। (সেহাহ)
- হযরত সাবেত ইবনে কায়সের কন্ঠস্বর স্বভাবগতভাবেই উচু ছিল। এ আয়াত নাযিলের পর তিনি ভয়ে সংযত হলেন এবং কন্ঠস্বর নিচু করলেন। (দুররে মনসুর)

- কাযী আবু বকর ইবনে আরাবী (রহ:) বলেন রাসূল (সা:) এর সম্মান ও আদব তার ওফাতের পরও জীবদ্দশার ন্যায় ওয়াজিব। কোন কোন আলেম বলেন তার কবরের সামনে উচ্চস্বরে কথা বরা আদবের খেলাফ। যে মজলিসে হাদীস পাঠ হয় সেখানে হট্টগোল করা বে-আদবী।

কণ্ঠস্বর উচু করলে আমল বিনষ্ট হবে কেন?

সৎকর্ম বিনষ্ট করে-

১) কুফরী ২) ঈমান ইচ্ছাধীন কাজ কুফরীও ইচ্ছাধীন কাজ।

কিন্তু আয়াতে বলা হয়েছে। সুতরাং এখানে কুফরীর শাস্তি কিভাবে হতে পারে।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ:) তার বায়ানুল কুরআনে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন্ রাসূলের কণ্ঠ থেকে উচু হলে বিনষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে কারন রাসূল কষ্ট পাবেন।

৩) হুজরার বাইরে থেকে ডাকাডাকি করাঃ

- ইমাম বগাভী (রহ:) কাতাদাহ (রা:) এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন বনু তামীমের লোকগণ দুপুরের সময় মদীনায় উপস্থিত হয়েছিল। তখন রাসূল (সা:) কোন এক হুজরায় বিশ্রামরত ছিলেন। তারা ছির বেদুঈন এবং সামাজিকতার রীতি নীতি থেকে অজ্ঞ। তারা হুজরার বাইরে থেকেই ডাকাডাকি শুরু করল।

- "হে মুহাম্মদ আমাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আসুন" (মাযহারা)

সাহাবী ও তাবেয়ীগণ তাদের আলেমদের সাথেও অনুরুপ ব্যবহার করতেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত আছে- আমি যখন কোন আলেম সাহাবীর কাছে থেকে কোন হাদীস লাভ করতে চাইতাম তখন তার গৃহে পৌছে ডাকাডাকি বা দরজার কড়া নাড়া থেকে বিরত থাকতাম এবং দরজার বাইরে বসে অপেক্ষা করতাম। তিনি যখন নিজেই বাইরে আসতেন তখন আমি তার নিকট হাদীস জিজ্ঞেস করতাম। তিনি দেখে বলতেন হে রাসূলুল্লাহর চাচাত ভাই আমাকে আপনি কড়া নেড়ে সংবাদ দিলেনা কেন। উত্তরে বলতাম- আল্লাহর নির্দেশ তাদের বাইরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

হযরত আবু ওবায়দা (রহ:) বলেন আমি কোনদিন কোন আলেমের দরজায় গিয়ে কড়া নাড়া দেইনি বরং অপেক্ষা করেছি যে, তিনি নিজেই বাইরে আসলে সাক্ষাত করব। (রুহুল মা'আনী)

আরো কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাঃ

- সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল উৎস হচ্ছেন আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল। তাই বাকী সব সিদ্ধান্ত হবে সেই উৎসের ভিত্তিতে।
- চলা ফেরায় যেমন দায়িত্বশীলের আগে চলা যাবেনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণেও দায়িত্বশীলের আগে যাওয়া যাবেনা-পাশ কাঠিয়ে যাওয়া যাবে না।
- রাসূলের মজলিসে তথা কুরআন হাদীসের আলোচনা হয় এমন বৈঠকে অথবা বৈঠক চলাকালীন এর আশে পাশে কথা বলা যাবেনা।
- দায়িত্বশীলের সামনে উচ্চ কণ্ঠে কথা বলা যাবেনা। দায়িত্বশীলের কথার উপরে কথা বলা যাবেনা।
- কারো সাথে দেখা করতে এ্যাপোয়েন্টম্যান্ট নিয়ে দেখা করতে হবে। টেলিফোন করতে সময় জ্ঞান থাকা চাই।
- বড় বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে এ সংক্রান্ত তথ্য ভাল ভাবে যাচাই করে নিতে হবে।

সংগৃহীত, সংকলিত ও ঈষৎ পরিমার্জিত।

বই: ইসলামী আন্দোলন " সাফল্যের শর্তাবলী"

সাইয়েদ আবুল আলা মাওদুদী, অনুবাদক: আব্দুল মান্নান তালিব

প্রকাশকের কথা:

১. এই পৃথিবীর বুকে মানুষের কোন উদ্দেশ্য, আন্দোলন, সংস্কামূলক কোন পদক্ষেপ সফল হতে হলে সে আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে সে আন্দোলনের বিশেষ গুণগুলো দেখা যায়।

২. সমস্যা সঙ্কুল এই দুনিয়ায় ইসলামী সমাজ-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া আখেরাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার উত্তম পথ নেই।

৩. এ আন্দোলন তার কর্মীদের কাছে আশা করে অধিক কর্মপ্রেরণা, ত্যাগ আর কুরবাণী। দাবী করে বিশেষ যোগ্যতা ও বৈশিষ্টের।

ভুমিকা:

*** সমস্যা:**

১. জাতির মধ্যে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আকাঙ্খিত লোকের অভাব নেই। অভাব হলো আগ্রহ ও উদ্যোগের, তার চেয়ে বেশী অভাব যোগ্যতার।

২. জাতি সমগ্র প্রভাবশালী অংশ সমাজে বিকৃতি ও ভাঙ্গণ সৃষ্টিতে মুখর। আর যারা সমাজে বিকৃতি ও ভাঙ্গণের কাজে লিপ্ত নেই তারাও সৃষ্টি বিন্যাসের চিন্তামুক্ত।

৩. বর্তমান যুগে সমাজ জীবন পরিগঠন ও ভাঙ্গার বৃহত্তম শক্তি হচ্ছে সরকার।

*** সম্ভাবনা:**

১. জাতি সামগ্রিকভাবে অসৎপ্রবন নয়।

২. বিচক্ষনতার সাথে সুসংঘবদ্ধ প্রচেষ্ঠা চালালে জনমত একদিন সত্যের পথে আসবেই।

৩. বিকৃতির কাজে লিপ্ত বাতিলের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তির অভাব। এক- চারিত্রিক শক্তি, দুই- ঐক্যের শক্তি।

শিক্ষনীয়:

১. দ্বীনপ্রতিষ্ঠার কাজ আল্লাহর কাজ । এ জন্য শর্ত হল ধৈর্য্য, আন্তরিকতা এবং বুদ্ধি বিচক্ষনতা দিয়ে সামনে আগানো।

২. আল্লাহরপ্রদত্ত নীতির অনুসরন।

৩. সাময়িক আবেগ দিয়ে নয় সুস্থ মস্তিস্কে, সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে একাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

বইটির মূল অংশ পাঁচ ভাগে বিভক্ত:

১. ব্যক্তিগত গুণাবলী- ক. ইসলামের যথার্থ জ্ঞান। খ. ইসলামেরপ্রতি অবিচল বিশ্বাস। চরিত্র ও কর্ম। ঘ. দ্বীন হচ্ছে জীবনোদ্দেশ্য।

২. দলীয় গুণাবলী- ক.ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা। খ.পারস্পরিক পরামর্শ। সংগঠন ও শৃংখলা। ঘ.সংস্কারের উদ্দেশ্যে সমালোচনা।

৩. পূর্ণতাদানকারী গুণাবলী- ক. খোদার সাথে সম্ককর্ক ও আন্তরিকতা। খ.আখেরাতের চিন্তা। গ. চরিত্র মাধুর্য। ঘ. ধৈর্য্য। ও ঙ. প্রজ্ঞা।

চরিত্র ও মাধুর্যের কতিপয় বিষয়াবলী:

১. উদার হ্রদয় ও বিপুল হিম্মত।

২. সৃষ্টিরপ্রতি সহানুভুতিশীল ও মানবতার দরদী।

৩. ভদ্র ও কোমল স্বভাব সম্পন্ন।

৪. আত্মনিভরশীল ও কষ্টসহিষ্ণু।

৫. মিষ্টভাষী ও সদালাপী।

৬. তাদের দ্বারা কোন ক্ষতির আশংকা ও কেউ করবে না বরং তাদের থেকে কল্যান কামনা করবে।

৭. নিজেদেও প্রাপ্যের চেয়ে কমের উপর সন্তুষ্ট থাকবে এবং অপরকে বেশী দিতেপ্রস্তুত থাকবে।

৮. মন্দের জবাব ভাল দিয়ে দেবে।

৯. নিজের দোষ-ত্রুটি স্বীকার করবে এবং অন্যের গুণাবলীর কদর করবে।

১০. অন্যের দুর্বলতার প্রতি নজর না দেয়ার মতো বিরাট হৃদয়পটের অধিকারী হবে।

১১. অন্যের দোষ-ক্রুটি ও বাড়াবাড়ি মাফ করে দেবে এবং নিজের জন্য কারোর উপরপ্রতিশোধ নেবে না।

১২. অন্যের সেবা গ্রহন করে নয় ,অন্যকে সেবা করে আনন্দিত হবে।

১৩. নিজের স্বার্থে নয় , অন্যের ভালোর জন্য কাজ করবে।

১৪. কোন প্রশংসার অপেক্ষা না করে , কোন নিন্দার তোয়াক্কা না করে নিজের দায়িত্ব পালন করবে।

১৫. খোদা ছাড়া আর কারোর পুরস্কারের প্রতি দৃষ্টি দেবে না।

১৬. তাদেরকে বল প্রয়োগে দমন করা যাবে না।

১৭. ধন-সম্পদের বিনিময়ে ক্রয় করা যাবে না কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের সামনে নির্দ্বিধায় ঝুকে পড়বে।

১৮. তাদের ভদ্রতা ও ন্যায়নীতির ব্যাপারে শত্রুদের ও আস্থা থাকবে।

ধৈর্য্যের কতিপয় বিষয়াবলী:

১. তাড়াহুড়ো না করা , নিজের প্রচেষ্টার ত্বরিত ফল লাভের জন্য অস্থির না হওয়া এবং বিলম্ব দেখে হিম্মত না হারানো।

২. তিক্ত স্বভাব, দুর্বল মত ও সংকল্পহীনতার রোগে আক্রান্ত না হওয়া।

৩. বাধা বিপত্তির বীরোচিত মোকাবেলা করা।

প্রজ্ঞার কতিপয় বিষয়াবলী:

১. গভীর দৃষ্টি।

২. চিন্তাশক্তি।

৩. বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তিরপ্রয়োজন।
৪. পরিষ্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।
৫. বিচার বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতা রাখে এবং জীবন সমস্যা বুঝার ও সমাধানের যোগ্যতা রাখে।
এসব গুণকেই এক কথায় বলা হয় প্রজ্ঞা।

৪. মৌলিক ও অসৎ গুণাবলী: ক. গর্ব ও অহঙ্কার। খ.প্রদর্শনেচ্ছা গ. ত্রুটিপূর্ণ নিয়ত।

গর্ব ও অহঙ্কার থেকে বাঁচার উপায়:

১. বন্দেগীর অনুভূতি। ২. আত্মবিচার । ৩. মহৎ ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টি। ৪. দলগত প্রচেষ্টা।

প্রদর্শনেচ্ছা থেকে বাঁচার উপায়: ১. ব্যক্তিগতপ্রচেষ্টা। ২. সামষ্টিকপ্রচেষ্টা।

৫. মানবিক দুর্বলতা- ক) আত্মপুজা। খ) আত্মপ্রীতি।

বাঁচার উপায় : তওবা ও এস্তেগফার।

গ) হিংসা বিদ্বেষ । ঘ) কু-ধারণা। ঙ) গীবত। চ) চোগলখোরী। ছ) কানাকানি ও ফিসফিসানী। জ) মেজাজের ভারসাম্যহীনতা। ঝ) একগুয়েমী। ঞ) একদেশদর্শীতা। ট) সামষ্টিক ভারসাম্যহীনতা। ঠ) সংকীর্ণমনতা।

এপ্রিল-২১ কুরআন অধ্যয়ন: সূরা আর রা'দ (২২-২৬) নং আয়াত

وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُوْلَـٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ
22 جَنَّـٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآئِهِمْ وَأَزْوَٰجِهِمْ وَذُرِّيَّـٰتِهِمْ ۖ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ 23 سَلَـٰمٌ عَلَيْكُم
بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ 24 وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَـٰقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ
فِى ٱلْأَرْضِ ۙ أُوْلَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ 25 ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا
فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ إِلَّا مَتَـٰعٌ 26

(২২) তারা তাদের প্রতিপালকের চেহারা (সন্তুষ্টি) কামনায় ধৈর্য ধারণ করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, আর আমি তাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি তাথেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে। তারা অন্যায়কে ন্যায় দ্বারা প্রতিরোধ করে। পরকালের ঘর প্রাপ্তি এদের জন্যই নির্দিষ্ট। (২৩) স্থায়ী জান্নাতসমূহ, যাতে তারা এবং তাদের পিতৃপুরুষগণ, তাদের স্ত্রীগণ ও তাদের সন্তানদের মধ্যে যারা সৎ ছিল তারা প্রবেশ করবে। আর ফেরেশতারা প্রতিটি দরজা দিয়ে তাদের নিকট প্রবেশ করবে। (২৪) (আর বলবে) 'শান্তি তোমাদের উপর, কারণ তোমরা সবর করেছ, আর আখিরাতের এ পরিণাম কতই না উত্তম'। (২৫) আর যারা আল্লাহর সাথে শক্ত ও'য়াদা করার পর তা ভঙ্গ করে, আল্লাহ যা বহাল রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে, আর যমীনে অশান্তি সৃষ্টি করে, তাদের প্রতি অভিশাপ, তাদের জন্য আছে অতিশয় মন্দ আবাসস্থল। (২৬) আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন রিযক বাড়িয়ে দেন এবং সঙ্কুচিত করেন। আর তারা দুনিয়ার জীবন নিয়ে উৎফুল্লতায় আছে, অথচ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন খুবই নগণ্য।

সূরা আর্ রাদ (অর্থ, নামকরণ, শানে নুযূল, পটভূমি ও বিষয়বস্তু)

নামকরণঃ

তের নম্বর আয়াতের (আরবী) বাক্যাংশের "আর্ রা'দ" শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এ নামকরণের মানে এ নয় যে, এ সূরায় রা'দ অর্থাৎ মেঘগর্জনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বরং এটা শুধু আলামত হিসেবে একথা প্রকাশ করে যে, এ সূরায় "রাদ" উল্লেখিত হয়েছে বা "রা'দ"-এর কথা বলা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কালঃ

৪ ও ৬ রুকূ'র বিষয়বস্তু সাক্ষ দিচ্ছে, এ সূরাটিও সূরা ইউনূস, হূদ ও আ'রাফের সমসময়ে নাযিল হয়। অর্থাৎ সক্কায় অবস্থানের শেষ যুগে। বর্ণনাভংগী থেকে পরিষ্কার প্রতীয়মান হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাওয়াত শুরু করার পর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেছে। বিরোধী পক্ষ তাঁকে লাঞ্ছিত করার এবং তাঁর মিশনকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে থাকে। মুমিনরা বারবার এ আকাংখা পোষণ করতে থাকে, হায়! যদি কোন প্রকার অলৌকিক কান্ড-কারখানার মাধ্যমে এ লোকগুলোকে সত্য সরল পথে আনা যায়। অন্যদিকে আল্লাহ মুসলমানদেরকে এ মর্মে বুঝাচ্ছেন যে, ঈমানের পথ দেখাবার এ পদ্ধতি আমার এখানে প্রচলিত নেই আর যদি ইসলামের শত্রুদের রশি ঢিলে করে দেয়া হয়ে থাকে তাহলে এটা এমন কোন ব্যাপার নয় যার ফলে তোমরা ভয় পেয়ে যাবে। তারপর ৩১ আয়াত থেকে জানা যায়, বার বার কাফেরদের হঠকারিতার এমন প্রকাশ ঘটেছে যারপর ন্যায়সংগতভাবে একথা বলা যায় যে, যদি কবর থেকে মৃত

ব্যক্তিরাও উঠে আসেন তাহলেও এরা মেনে নেবে না বরং এ ঘটনার কোন না কোন ব্যাখ্যা করে নেবে। এসব কথা থেকে অনুমান করা যায় যে, এ সূরাটি মক্কার শেষ যুগে নাযিল হয়ে থাকবে।

কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুঃ
সূরার মূল বক্তব্য প্রথম আয়াতেই বলে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু পেশ করছেন তাই সত্য কিন্তু এ লোকেরা তা মেনে নিচ্ছে না, এটা এদের ভুল। এ বক্তব্যই সমগ্র ভাষণটির কেন্দ্রীয় বিষয়। এ প্রসংগে বার বার বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাওহীদ, রিসালাত ও পরকালের সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। এগুলোর প্রতি ঈমান আনার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ফায়দা বুঝানো হয়েছে। এগুলো অস্বীকার করার ক্ষতি জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এ সংগে একথা মনের মধ্যে গেঁথে দেয়া হয়েছে যে, কুফরী আসলে পুরোপুরি একটি নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তারপর এ সমগ্র বর্ণনাটির উদ্দেশ্য শুধুমাত্র বুদ্ধি-বিবেককে দীক্ষিত করা নয় বরং মনকে ঈমানের দিকে আকৃষ্ট করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। তাই নিছক বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল-প্রমাণ পেশ করেই শেষ করে দেয়া হয়নি, এসংগে এক একটি দলীল এ এক একটি প্রমাণ পেশ করার পর থেমে গিয়ে নানা প্রকার ভীতি প্রদর্শন, উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি এবং স্নেহপূর্ণ ও সহানুভূতিশীল উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে অজ্ঞ লোকদের নিজেদের বিভ্রান্তিকর হঠকারিতা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

ভাষণের মাঝখানে বিভিন্ন জায়গায় বিরোধীদের আপত্তিসমূহের উল্লেখ না করেই তার জবাব দেয়া হয়েছে। মুহাম্মাদ (সাঃ) এর দাওয়াতের ব্যাপারে লোকদের মনে যেসব সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল অথবা বিরোধীদের পক্ষ থেকে সৃষ্টি করা হচ্ছিল সেগুলো দূর করা হয়েছে। এ সংগে মুমিনরা কয়েক বছরের দীর্ঘ ও কঠিন সংগ্রামের কারণে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছিল এবং অস্থির চিত্তে অদৃশ্য সাহায্যের প্রতীক্ষা করছিল, তাই তাদেরকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে।

ব্যাখ্যা:

যারা স্বীয় পালনকর্তার আদেশ পালন করে (এবং তাওহীদ ও আনুগত্যের পথ অবলম্বন করে,) তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান (অর্থাৎ জান্নাত নির্ধারিত) আছে এবং যারা তাঁর আদেশ পালন করে না (এবং কুফর ও গুনাহে কায়েম থাকে) তাদের কাছে (কিয়ামতের দিন) যদি সারা জগতের বিষয়-সম্পদ (বিদ্যমান) থাকে, (বরঞ্চ) তার সাথে সে সবের সমপরিমাণ আরও (অর্থসম্পদ) থাকে, তবে সবই মুক্তির জন্য দিয়ে ফেলবে। তাদের কঠোর শাস্তি হবে। (অন্য এক আয়াতে حساب عسير' মুশকিল হিসাব' বলা হয়েছে)। তাদের ঠিকানা (সদাসর্বদার জন্য) দোযখ। এটা নিকৃষ্ট অবস্থানস্থল। যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, যা কিছু আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তা সবই সত্য, সে কি ঐ ব্যক্তির মত হতে পারে, যে (এ জ্ঞান থেকে নিরেট) অন্ধ ? (অর্থাৎ কাফির ও মু'মিন সমান নয়)। অতএব, বুদ্ধিমানরাই উপদেশ গ্রহণ করে (এবং) তারা (বুদ্ধিমানরা) এমন যে, আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং (এ) অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না এবং তারা এমন যে, আল্লাহ্ যেসব সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ দিয়েছেন, সেগুলো বজায় রাখে, স্বীয় পালনকর্তাকে ভয় করে এবং কঠোর শাস্তির আশংকা করে (যা বিশেষভাবে কাফিরদের জন্যই। তাই কুফর থেকে বেঁচে থাকে)। এবং তারা এমন যে, স্বীয় পালনকর্তার সন্তুষ্টির কামনায় (সত্য ধর্মে) অটল থাকে, নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি, তা থেকে গোপনেও এবং প্রকাশ্যভাবেও (যখন যেরূপ করা সমীচীন হয়) ব্যয় করে এবং (অপরে) দুর্ব্যবহারকে (যা তাদের সাথে করা হয়) সদ্ব্যবহার দ্বারা এড়িয়ে যায়। (অর্থাৎ কেউ তাদের সাথে অসদ্ব্যবহার করলে তারা কিছু মনে করে না; বরং তার সাথে সদ্ব্যবহার করে)। তাদের জন্য সে জগতে (অর্থাৎ পরকালে) উত্তম পরিণাম রয়েছে, (অর্থাৎ সদাসর্বদা বসবাসের উদ্যান,) যাতে তারাও প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতামাতা স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা (জান্নাতের) যোগ্য (অর্থাৎ মু'মিন) হবে, (যদিও পূর্বোক্তদের সমপর্যায়ভুক্ত না হয়) তারাও (জান্নাতে তাদের কল্যাণে তাদেরই শ্রেণীতে) প্রবেশ করবে এবং ফেরেশতারা তাদের কাছে প্রত্যেক (দিকের) দরজা দিয়ে আগমন করবে। (তারা বলবেঃ) তোমরা (প্রত্যেক বিপদ আশংকা থেকে) শান্তিতে থাকবে এ কারণে যে, (তোমরা সত্যধর্মে) অটল ছিলে। অতএব এ জগতে তোমাদের পরিণাম খুবই ভাল।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে উদাহরণের মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে সত্যপন্থী ও মিথ্যাপন্থীদের লক্ষণাদি, গুণাবলী, ভাল ও মন্দ কাজকর্ম এবং প্রতিদান ও শাস্তি বর্ণিত হয়েছে।

প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলার বিধানাবলী পালন ও আনুগত্যকারীদের জন্য উত্তম প্রতিদান এবং অবাধ্যতাকারীদের জন্য কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথমে আল্লাহর বিধানাবলী পালনকারীদের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ

الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ

অর্থাৎ তারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে । সৃষ্টির সূচনায় আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের কাছ থেকে যেসব ওয়াদা অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, এখানে সেগুলোই বুঝান হয়েছে। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম ছিল পালনকর্তা সম্পর্কিত অঙ্গীকার। এটি সৃষ্টির সূচনাকালে সকল আত্মাকে সমবেত করে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিলঃ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ -অর্থাৎ আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই ? উত্তরে সবাই সমস্বরে বলেছিলঃ بَلَى অর্থাৎ হ্যাঁ, আপনি অবশ্যই আমাদের পালনকর্তা। এমনিভাবে যাবতীয় বিধি-বিধানের আনুগত্য, সমস্ত ফরয কর্ম পালন এবং অবৈধ বিষয়াদি

থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে উপদেশ এবং বান্দার পক্ষ থেকে স্বীকারোক্তি কোরআন পাকের বিভিন্ন আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ - অর্থাৎ তারা কোন অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না। ঐ অঙ্গীকারও এর অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ্ তা'আলা ও বান্দার মধ্যে রয়েছে এবং এইমাত্র يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া ঐসব অঙ্গীকারও এর অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো উম্মতের লোকেরা আপন পয়গম্বরের সাথে সম্পাদন করে এবং ঐসব অঙ্গীকারও বোঝান হয়েছে, যেগুলো মানবজাতি একে অপরের সাথে করে।

আবূ দাউদ আওফ ইবনে মালেকের রিওয়ায়েতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামের কাছ থেকে এ বিষয়ে অঙ্গীকার ও বায়'আত নিয়েছেন যে, তাঁরা আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করবেন না, পাঞ্জেগানা নামায পাবন্দি সহকারে আদায় করবেন, নিজেদের মধ্যকার শাসক শ্রেণীর আনুগত্য করবেন এবং কোন মানুষের কাছে কোন কিছু যাচঞা করবেন না।

যারা এ বায়'আতে অংশগ্রহণ করেছিলেন, অঙ্গীকার পালনের ব্যাপারে তাঁদের নিষ্ঠার তুলনা ছিল না। অশ্বারোহণের সময় তাঁদের হাত থেকে চাবুক পড়ে গেলেও তাঁরা কোন মানুষকে চাবুকটি উঠিয়ে দিতে বলতেন না; বরং স্বয়ং নিচে নেমে তা উঠিয়ে নিতেন।

এটা ছিল সাহাবায়ে কিরামের মনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভালবাসা, মাহাত্ম্য ও আনুগত্য প্রসূত প্রেরণার প্রভাব। নতুবা বলাই বাহুল্য যে, এ ধরনের যাচঞা নিষিদ্ধ করা উদ্দেশ্য ছিল না। উদাহরণত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) একবার মসজিদে প্রবেশ করছিলেন। এমতাবস্থায় দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ভাষণ দিচ্ছেন। ঘটনাক্রমে তাঁর মসজিদে প্রবেশ করার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখ থেকে 'বসে যাও' কথাটি বের হয়ে গেল। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ জানতেন যে, এর অর্থ এটা নয় যে, কেউ সড়কে অথবা সভাস্থলের বাইরে থাকলেও সেখানেই বসে যাবে। কিন্তু আনুগত্যের প্রেরণা তাঁকে সামনে পা বাড়াতে দিল না। দরজার বাইরেই যেখানে এ বাক্যটি কানে এসেছিল, তিনি সেখানেই বসে গেলেন।

তৃতীয় গুণ: আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যশীল বান্দাদের তৃতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যেসব সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ করেছেন, তারা সেগুলো বজায় রাখে। এ বাক্যটির প্রচলিত তফসীর এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আত্মীয়তার যেসব সম্পর্ক বজায় রাখতে এবং তদনুযায়ী কাজ করতে আদেশ করেছেন, তারা সেসব সম্পর্ক বজায় রাখে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেনঃ এর অর্থ এই যে, তারা ঈমানের সাথে সৎকর্মকে অথবা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি বিশ্বাসের সাথে পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের প্রতি এবং তাঁদের গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাসকে যুক্ত করে।

চতুর্থ গুণ এইঃ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ -অর্থাৎ তারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে। এখানে خوف শব্দের পরিবর্তে خشية শব্দ ব্যবহার করায় এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি তাদের ভয় হিংস্র জন্তু অথবা ইতর মানুষের প্রতি স্বাভাবিক ভয়ের মত নয়। বরং তা পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের এবং উস্তাদের প্রতি শিষ্যের অভ্যাসগত ভয়ের মত। কষ্টদানের আশংকা এ ভয়ের কারণ নয়; বরং মাহাত্ম্য ও ভালবাসার কারণে বান্দা এরূপ আশংকা করে যে, আমাদের কোন কর্ম অথবা কথা যেন আল্লাহ্ তা'আলার কাছে অপছন্দনীয় না হয়ে যায়। এ কারণেই যেখানে প্রশংসা স্থলে আল্লাহর ভয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেই خشية শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ, মাহাত্ম্য ও ভালবাসার কারণ থেকে উদ্ভূত ভয়কে خشية বলা হয়। এ কারণেই পরবর্তী বাক্যে হিসাব কিতাবের কঠোরতার ভয় বর্ণনা প্রসঙ্গে خشية - এর পরিবর্তে خوف শব্দটি ব্যবহার করে বলা হয়েছেঃ

وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ

পঞ্চম গুণ অর্থাৎ তারা মন্দ হিসাবকে ভয় করে। 'মন্দ হিসাব' বলে কঠোর ও পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব বোঝান হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা) বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা যদি কৃপাবশত সংক্ষেপে ও মার্জনা সহকারে হিসাব গ্রহণ করেন, তবেই মানুষ মুক্তি পেতে পারে। নতুবা যার কাছ থেকেই পুরোপুরি ও কড়ায় গণ্ডায় হিসাব নেওয়া হবে, তার পক্ষে আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভবপর হবে না। কেননা, এমন ব্যক্তি কে আছে, যে জীবনে কখনো কোন গুনাহ্ বা ত্রুটি করেননি ? এ হচ্ছে সৎ ও আনুগত্যশীল বান্দাদের পঞ্চম গুণ।

ষষ্ঠ গুণ এইঃ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ অর্থাৎ যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার আশায় অকৃত্রিমভাবে ধৈর্যধারণ করে।

প্রচলিত কথায় কোন বিপদ ও কষ্টে ধৈর্যধারণ করাকেই সবরের অর্থ মনে করা হয় কিন্তু আরবী ভাষায় এর অর্থ আরও অনেক ব্যাপক। কারণ, আসল অর্থ হচ্ছে স্বভাব-বিরুদ্ধ বিষয়াদির কারণে অস্থির না হওয়া; বরং দৃঢ়তা সহকারে নিজের কাজে ব্যাপৃত থাকা। এ কারণেই এর দুটি প্রকার বর্ণনা করা হয়। এক. صبر على الطاعة অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-বিধান পালনে দৃঢ় থাকা এবং দুই. صبر على المعصية অর্থাৎ গুনাহ্ থেকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে দৃঢ় থাকা।

সবরের সাথে ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ কথাটি যুক্ত হয়ে ব্যক্ত করেছে যে, সবর সর্বাবস্থায় শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় নয়। কেননা, কোন না কোন সময় বেসবর ব্যক্তিরও দীর্ঘ দিন পরে হলেও সবর এসেই যায়। কাজেই যে সবর ইচ্ছাধীন নয়, তার বিশেষ কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। এরূপ অনিচ্ছাধীন কাজের আদেশ আল্লাহ্ তা'আলা দেন না। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ الصبر عند الصدمة الاولى অর্থাৎ আসল ও ধর্তব্য সবর তাই যা বিপদের প্রাথমিক পর্যায়ে অবলম্বন করা হয় নতুবা পরবর্তীকালে তো কোন কোন সময় বাধ্যতামূলকভাবে মানুষের মধ্যে সবর এসেই যায়। সুতরাং স্বেচ্ছায় স্বভাববিরুদ্ধ বিষয়কে সহ্য করাই প্রশংসনীয় সবর; তা হোক কোন ফরয ও ওয়াজিব পালন করা কিংবা হারাম ও মকরূহ বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করা।

এ কারণেই যদি কোন ব্যক্তি চুরির নিয়তে কোন গৃহে প্রবেশ করে, অতঃপর সুযোগ না পেয়ে সবর করে ফিরে আসে, তবে এ অনিচ্ছাধীন সবর কোন প্রশংসনীয় ও সওয়াবের কাজ নয়। সওয়াব তখনই হবে, যখন গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা আল্লাহর ভয়ে ও তাঁর সন্তুষ্টির কারণে হয়।

সপ্তম গুণ হচ্ছেঃ أَقَامُوا الصَّلَاةَ -'নামায কায়েম করার' অর্থ পূর্ণ আদব ও শর্ত এবং বিনয় ও নম্রতা সহকারে নামায আদায় করা–শুধু নামায পড়া নয়। এ জন্যই কোরআনে নামাযের নির্দেশ সাধারণত اقامة صلاة শব্দ সহযোগে দেওয়া হয়েছে।

অষ্টম গুণ হচ্ছেঃ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিক থেকে কিছু আল্লাহর নামেও ব্যয় করে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাছে চান না; বরং নিজেরই দেওয়া রিযিকের কিছু অংশ তাও মাত্র শতকরা আড়াই ভাগের মত সামান্যতম পরিমাণ তোমাদের কাছে চান। এটা দেওয়ার ব্যাপারে স্বভাবত তোমাদের ইতস্তত করা উচিত নয়।

অর্থ-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করার সাথে سِرًّا وَعَلَانِيَةً (শব্দ দু'টি যুক্ত হওয়ায় বোঝা যায় যে, সদকা-খয়রাত সর্বত্র গোপনে করাই সুন্নত নয়; বরং মাঝে মাঝে প্রকাশ্যে করাও দুরস্ত ও শুদ্ধ। এ জন্যেই আলিমগণ বলেন যে, যাকাত ও ওয়াজিব সদকা প্রকাশ্যে দেওয়াই উত্তম এবং গোপনে দেওয়া সমীচীন নয়–যাতে অন্যরাও শিক্ষা ও উৎসাহ পায়। তবে নফল সদকা-খয়রাত গোপনে দেওয়াই উত্তম। যেসব হাদীসে গোপনে দেওয়ার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোতে নফল সদকা সম্পর্কেই বলা হয়েছে।

নবম গুণ হচ্ছেঃ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ অর্থাৎ তারা মন্দকে ভাল দ্বারা, শত্রুতাকে বন্ধুত্ব দ্বারা এবং অন্যায় ও জুলুমকে ক্ষমা ও মার্জনা দ্বারা প্রতিহত করে। মন্দের জওয়াবে মন্দ ব্যবহার করে না। কেউ কেউ এ বাক্যটির এরূপ অর্থ বর্ণনা করেন যে, পাপকে পুণ্য দ্বারা ব্যবহৃত করে। অর্থাৎ কোন সময় কোন গুনাহ্ হয়ে গেলে তারা অধিকতর যত্নসহকারে অধিক পরিমাণে ইবাদত করে। ফলে গুনাহ্ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত মু'আয (রা)-কে বলেনঃ পাপের পর পুণ্য করে নাও, তাহলে তা পাপকে মিটিয়ে দিবে। অর্থ এই যে, যখন পাপের পর অনুতপ্ত হয়ে তওবা করবে এবং এর পশ্চাতে পুণ্য কাজ করবে, তখন এ পুণ্য কাজ বিগত গুনাহকে মিটিয়ে দিবে। অনুতাপ ও তওবা ব্যতীত পাপের পর কোন পুণ্য কাজ করে নেওয়া পাপমুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়।

আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যশীলদের নয়টি গুণ বর্ণনা করার পর তাদের প্রতিদান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ –دار শব্দের অর্থ এখানে دار اخرت অর্থাৎ পরকাল । আয়াতের অর্থ হচ্ছে তাদের জন্যই রয়েছে পরকালের সাফল্য। কেউ কেউ বলেনঃ এখানে دار বলে دار دنيا অর্থাৎ ইহকাল বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই, সৎ লোকেরা যদি দুনিয়াতে কষ্টেরও সম্মুখীন হয়; কিন্তু পরিণামে দুনিয়াতেও সাফল্য তাদেরই প্রাপ্য অংশ হয়ে থাকে।

অতঃপর عُقْبَى الدَّارِ অর্থাৎ পরকালের সাফল্য বর্ণিত হয়েছে যে, তা হচ্ছে جَنَّاتُ عَدْنٍ তারা এগুলোতে প্রবেশ করবে। عَدْنٍ শব্দের অর্থ হচ্ছে অবস্থান ও স্থায়িত্ব। উদ্দেশ্য এই যে, এসব জান্নাত থেকে কখনও তাদেরকে বহিষ্কার করা হবে না; বরং এগুলোতে তাদের অবস্থান চিরস্থা হবে। কেউ কেউ বলেনঃ জান্নাতের মধ্যস্থলের নাম আদন। জান্নাতের স্থানসমূহের মধ্যে এটা উচ্চস্তরের।

এরপর তাদের জন্য আরও একটি পুরস্কার উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার এ নিয়ামত শুধু তাদের ব্যক্তিসত্তা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং তাদের বাপদাদা, স্ত্রী ও সন্তানরাও এর অংশ পাবে। শর্ত এই যে, তাদের উপযুক্ত হতে হবে। এর নূন্যতম স্তর হচ্ছে মুসলমান হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের বাপদাদা ও স্ত্রীদের নিজস্ব আমল যদিও এ স্তরে পৌছার যোগ্য নয়; কিন্তু আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের খাতিরে ও বরকতে তাদেরকেও এ উচ্চস্তরে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে।

এরপর তাদের আরও একটি পরকালীন সাফল্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফেরেশতারা তাদেরকে সালাম করতে করতে প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং বলবেঃ সবরের কারণে তোমরা যাবতীয় দুখ-কষ্ট থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছ। এটা পরকালের কতই না উত্তম পরিণাম !

তাফসীর ইবনে কাসীর ২২-২৪
পুণ্যবানদের গুণাবলী, যা জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে

আল্লাহ বলেন যে, যাদের মধ্যে এই উত্তম গুণাবলী রয়েছে, তারা ইহকাল ও পরকালে বিজয় ও সাফল্যের মাধ্যমে উত্তম ও চূড়ান্ত আবাস লাভ করবে।

الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلاَ يِنقُضُونَ الْمِيثَـقَ
(যারা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং আমানত ভঙ্গ করে না।) তারা সেই মুনাফিকদের মতো নয়, যারা অঙ্গীকার করলে তা ভঙ্গ করে; বিতর্ক করলে চরম ঝগড়াটে হয়; কথা বললে মিথ্যা বলে; এবং কোনো আমানত রাখলে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। এরপর আল্লাহ বললেন,

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ
(আর যারা আল্লাহ যা যুক্ত করতে আদেশ করেছেন তা যুক্ত করে) তারা তাদের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদয় হয় এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে না। তারা দরিদ্র ও অভাবীদের প্রতি দয়ালু এবং স্বভাবগতভাবে উদার।

وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
(এবং তারা তাদের প্রভুকে ভয় করে), তাদের কাজকর্ম ও কথাবার্তার ব্যাপারে। তারা স্মরণ রাখে যে, আল্লাহ এই সবকিছুর উপর নজর রাখছেন এবং পরকালে তাঁর ভয়াবহ হিসাবনিকাশ সম্পর্কে তারা ভীত। সুতরাং, তাদের সমস্ত কাজকর্ম, তা সক্রিয় হোক বা নিষ্ক্রিয়, সরল পথে ও সঠিক থাকে এবং তাদের সকল কাজে, এমনকি যা অন্যদের প্রভাবিত করে,

وَالَّذِينَ صَبَرُواْ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ
(আর যারা ধৈর্য ধারণ করে এবং তাদের রবের সন্তুষ্টি ও মহাপুরস্কারের অন্বেষণ করে,) তারা পাপ ও মন্দ কাজ থেকে দূরে থেকে ধৈর্য ধারণ করে; তারা নিজেদেরকে তাদের মহান ও সম্মানিত রবের সেবায় উৎসর্গ করে এবং তাঁর সন্তুষ্টি ও মহাপুরস্কারের আকাঙ্ক্ষায় এমনটি করে থাকে।

وَأَقَامُواْ الصَّلَوةَ
(এবং ধর্মের নির্ধারিত সীমা ও বিধান অনুযায়ী সালাতের সীমা, সময়, রুকু, সিজদা ও বিনয় রক্ষা করে সালাত আদায় করা),

وَأَنْفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
(এবং আমরা তাদেরকে যা দান করেছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে।) তারা তাদের ওপর ব্যয় করতে বাধ্য এমন ব্যক্তিদের ওপর ব্যয় করে, যেমন তাদের স্বামী বা স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন এবং সাধারণ দরিদ্র ও অভাবী ব্যক্তিরা।

سِرًّا وَعَلاَنِيَةً
(গোপনে ও প্রকাশ্যে,) তারা সর্বাবস্থায় ও সময়ে, দিন হোক বা রাত, গোপনে ও প্রকাশ্যে সময় কাটায়।

وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ
(এবং ভালো দিয়ে মন্দকে প্রতিহত করে) তারা উত্তম আচরণের দ্বারা মন্দকে প্রতিরোধ করে। যখন লোকেরা তাদের ক্ষতি করে, তখন তারা উত্তম ধৈর্য, সহনশীলতা, ক্ষমা ও মার্জনা সহকারে সেই ক্ষতির মোকাবিলা করে। আল্লাহ অন্য একটি আয়াতে বলেছেন,

وَلاَ تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيمٌ - وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّاهَآ إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ
(মন্দকে উত্তম কিছু দ্বারা প্রতিহত করো, তাহলে নিশ্চয়ই যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিল, সে এমন হয়ে যাবে যেন সে তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু ধৈর্যশীল ব্যক্তি ছাড়া আর কাউকেই তা দেওয়া হয় না - এবং দুনিয়ার মহান অংশের অধিকারী ছাড়া আর কাউকেই তা দেওয়া হয় না।) ৪১:৩৪-৩৫ এই কারণেই আল্লাহ এখানে বলেছেন যে, যাদের মধ্যে এই উত্তম গুণাবলী রয়েছে, অর্থাৎ বরকতময় ব্যক্তিরা, তারাই চূড়ান্ত আবাস অর্জন করবে, যা তিনি পরবর্তীতে ব্যাখ্যা করেছেন,

جَنَّـتِ عَدْنٍ
(আদন উদ্যান), যেখানে 'আদন' বলতে বোঝায় অবিরাম বসবাস; তারা অনন্ত জীবনের উদ্যানসমূহে বসবাস করবে। এরপর আল্লাহ বললেন,

وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابَائِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ

(এবং তাদের পিতা, স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্য থেকে যারা সৎকর্মশীল ছিল।) আল্লাহ তাদেরকে তাদের প্রিয়জনদের সাথে, তাদের পিতা, পরিবারের সদস্য ও সন্তানদের মধ্য থেকে, যারা সৎকর্মশীল এবং জান্নাতে প্রবেশের যোগ্য, তাদেরকে একত্রিত করবেন, যাতে তাদেরকে দেখে তাদের চোখ শান্তি পায়। তিনি তাঁর অনুগ্রহে নিম্ন পদমর্যাদার ব্যক্তিদের মর্যাদাকে উচ্চ পদমর্যাদায় উন্নীত করবেন, কিন্তু (জান্নাতে) উচ্চ পদমর্যাদার ব্যক্তিদের মর্যাদা হ্রাস করবেন না। আল্লাহ অন্য একটি আয়াতে বলেছেন,

وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَـنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

(আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং যাদের সন্তান-সন্ততিও ঈমানের সাথে তাদের অনুসরণ করে: আমরা তাদের বংশধরদেরকে তাদের সাথে মিলিত করব।) ৫২:২১ আল্লাহ অতঃপর বললেন,

جَنَّـتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابَائِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالمَلَـئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِّن كُلِّ بَابٍ - سَلَـمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

(এবং ফেরেশতারা প্রত্যেক দরজা দিয়ে তাদের কাছে প্রবেশ করবে (বলবে): সালামুন আলাইকুম (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক), কারণ আপনি ধৈর্য ধারণ করেছেন! নিশ্চয়ই এই চূড়ান্ত আবাস উত্তম!) ফেরেশতারা প্রত্যেক দিক থেকে তাদের কাছে প্রবেশ করবে এবং জান্নাতে প্রবেশের জন্য তাদের অভিনন্দন জানাবে। ফেরেশতারা ইসলামী অভিবাদনের মাধ্যমে তাদের স্বাগত জানাবে এবং আল্লাহর নৈকট্য ও পুরস্কার অর্জন করার জন্য, সেইসাথে শান্তির আবাসে, সম্মানিত রাসূলগণ, নবীগণ এবং সত্যবাদী মুমিনদের প্রতিবেশী হওয়ার জন্য তাদের প্রশংসা করবে। ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আল-আস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

«هَلْ تَدْرُونَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللهِ؟»

(তোমরা কি জানো আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে?) তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জ্ঞান অধিক। তিনি বললেন,

«أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللهِ الْفُقَرَاءُ الْمُهَاجِرُونَ الَّذِينَ تُسَدُّ بِهِمُ الثُّغُورُ، وَتُتَّقَى بِهِمُ الْمَكَارِهُ، وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ، لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ مَلَائِكَتِهِ: ائْتُوهُمْ فَحَيُّوهُمْ، فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: نَحْنُ سُكَّانُ سَمَائِكَ، وَخِيرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ، أَفَتَأْمُرُنَا أَنْ نَأْتِيَ هؤُلَاءِ وَنُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ؟ فَيَقُولُ: إِنَّهُمْ كَانُوا عِبَادًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، وَتُسَدُّ بِهِمُ الثُّغُورُ، وَتُتَّقَى بِهِمُ الْمَكَارِهُ، وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً قَالَ: فَتَأْتِيهِمُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ ذَلِكَ فَيَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَاب»

আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে সেই দরিদ্র মুহাজিরগণ, যাদের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দুর্গ সুরক্ষিত থাকে এবং নানা প্রকার বিপদ থেকে তাদের রক্ষা করা হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন অবস্থায় মারা যেত, যখন তার প্রয়োজন তার বুকের মধ্যেই থাকত, কারণ সে নিজে তা মেটাতে অক্ষম ছিল। আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা বলবেন, "তাদের কাছে যাও এবং তাদেরকে সালাম দিয়ে স্বাগত জানাও।" ফেরেশতারা বলবে, "আমরা তো আপনার জান্নাতের বাসিন্দা এবং আপনার সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আপনি কি আমাদের আদেশ করছেন তাদের কাছে যেতে এবং তাদেরকে সালাম দিয়ে স্বাগত জানাতে?" আল্লাহ বলবেন, "তারা আমার সেই বান্দা, যারা আমার ইবাদত করত এবং ইবাদতে আমার সাথে কাউকে বা কোনো কিছুকে অংশীদার করত না। তাদের জন্য পৃথিবীর দুর্গগুলো সুরক্ষিত ছিল এবং বিপদ থেকে তাদের রক্ষা করা হতো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন অবস্থায় মারা যেত, যখন তার প্রয়োজন তার বুকের মধ্যেই থাকত, কারণ সে নিজে তা মেটাতে অক্ষম ছিল। তাই ফেরেশতারা জান্নাতের প্রত্যেক দরজা দিয়ে তাদের কাছে যাবে," এই বলে,

سَلَـمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

(সালামু আলাইকুম (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক), কারণ আপনি ধৈর্য ধারণ করেছিলেন! নিশ্চয়ই আপনার চূড়ান্ত আবাস উত্তম!)

وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَـقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُ الأَرْضِ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

24 وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَـٰقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ۙ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ

২৫. পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং যমীনে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্যই রয়েছে লা'নত এবং তাদের জন্য রয়েছে আখেরাতের মন্দ আবাস।(১)

(১) এ আয়াতে সে সমস্ত অপরিণামদর্শী লোকদের আলোচনা করা হচ্ছে, যারা পূর্ববর্তী গুণগুলোর বিপরীত কাজ করে। তাদের জন্য কি শাস্তি রয়েছে তাও বর্ণনা করা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] এ সমস্ত অবাধ্য বান্দাদের স্বভাব হলো যে, **তারা আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকারকে পাকাপোক্ত করার পর তা ভংগ করে থাকে**। হাদীসে অঙ্গীকার ভঙ্গ করাকে মুনাফিকের একটি আলামত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। [ইবন

কাসীর] অবাধ্য বান্দাদের **দ্বিতীয় স্বভাব** এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, তারা ঐসব সম্পর্ক ছিন্ন করে, যেগুলো বজায় রাখতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। আত্মীয়তার সম্পর্কও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া সমস্ত নবী-রাসূলদের উপর ঈমান আনাও এর অন্তর্ভুক্ত। [কুরতুবী]

তৃতীয় স্বভাব এই যে, তারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে। তারা কুফরি ও গোনাহ করে যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে। [কুরতুবী] যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও মানুষের অঙ্গীকারের পরওয়া করে না এবং কারো অধিকার ও সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য করে না, তাদের কর্মকাণ্ড যে অপরাপর লোকদের ক্ষতি ও কষ্টের কারণ হবে, তা বলাই বাহুল্য। ঝগড়া-বিবাদ ও মারামারি-কাটাকাটির বাজার গরম হবে। এটা এক বিরাট ফাসাদ।

আবুল আলীয়া রাহেমাহুল্লাহ বলেন, মুনাফিক শ্রেণীর লোক যখন মানুষের উপর কর্তৃত্ব করে তখন ছয়টি খারাপ অভ্যাস ও কর্ম করে থাকেঃ কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তার বিপরীত কাজ করে, তাদের কাছে আমানত রাখা হলে তা খেয়ানত করে, আল্লাহর নেয়া অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করে, আল্লাহ যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন তা কর্তন করে এবং যমীনের মধ্যে বিপর্যয় ও ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে। আর যখন তারা কর্তৃত্বে থাকে না বা অন্যরা তাদের উপর কর্তৃত্ব করে তখন তারা তিনটি কাজ করেঃ কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তার বিপরীত করে এবং আমানতের খেয়ানত করে। [ইবন কাসীর] হাদীসেও তাদের কর্মকাণ্ডের কথা বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি, যখন কথা বলবে মিথ্যা বলবে, যখন ওয়াদা করবে তার বিপরীত করবে এবং যখন আমানত রাখা হবে তখন তার খেয়ানত করবে।
باب عَلاَمَةِ الْمُنَافِقِ

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قَالَ " آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ".
পরিচ্ছেদঃ ২/২৪. মুনাফিকের চিহ্ন

৩৩. আবূ হুরাইরাহ (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুনাফিকের চিহ্ন তিনটিঃ ১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে; ২. যখন অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে এবং ৩. আমানত রাখা হলে খিয়ানাত করে। (২৬৮২,২৭৪৯,৬০৯৫; মুসলিম ১/২৫ হাঃ ৫৯, আহমাদ ৯১৬২) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩২, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৩২)

[বুখারীঃ ৩৩, মুসলিমঃ ৫৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, যখন অঙ্গীকার করবে তা ভঙ্গ করবে, যখন ঝগড়া করবে গালি-গালাজ করবে। [বুখারীঃ ৩৪, মুসলিমঃ ৫৮]

অবাধ্য বান্দাদেও এই সমস্ত স্বভাব বর্ণনা করার পর তাদেও শাস্তি উল্লেখ কওে বলা হয়েছে যে, তাদেও জন্য লানত ও মন্দ আবাস রয়েছে। লানতের অর্থ আল্লাহর রহমত থেকে দূওে থাকা এবং বঞ্চিত হওয়া। [কুরতুবী] বলাবাহুল্য, আল্লাহর রহমত থেকে দূওে থাকাই সর্বাপেক্ষা বড় আযাব এবং সব বিপদেও বড় বিপদ। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যেমন অনুগত বান্দাদেও প্রতিদান উল্লেখ কওে বলা হয়েছিল যে, তাদেও স্থান হবে জান্নাতে, ফিরিশতারা তাদেরকে সালাম কওে বলবে যে, এসব নেয়ামত তোমাদেও সবর ও আনুগত্যেও ফলশ্রুতি, তেমনিভাবে এ আয়াতে অবাধ্যদেও অশুভ পরিণতি বর্ণনা কওে বলা হয়েছে যে, তাদেও উপর আল্লাহর লানত অর্থাৎ তারা আল্লাহর রহমত থেকে দূওে এবং তাদেও জন্য জাহান্নামের আবাস অবধারিত। এতে বুঝা যায় যে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এবং আত্মীয় ও স্বজনদেও সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা অভিসম্পাত ও জাহান্নামের কারণ।

-------তাফসীরে জাকারিয়া

ٱللَّهُ يَبۡسُطُ ٱلرِّزۡقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقۡدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَا فِى ٱلۡأَخِرَةِ إِلَّا مَتَـٰعٌ

২৬. আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছে তার জীবনোপকরণ বৃদ্ধি করেন এবং সংকুচিত করেন; কিন্তু এরা দুনিয়ার জীবন নিয়েই আনন্দিত, অথচ দুনিয়ার জীবন তো আখিরাতের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ভোগমাত্র।(১)

(১) এ আয়াতের পটভূমি হচ্ছে, সাধারণ মূর্খ ও অজ্ঞদের মতো মক্কার কাফেররাও বিশ্বাস ও কর্মের সৌন্দর্য বা কদৰ ¨ তা দেখার পরিবর্তে ধনাঢ্যতা বা দারিদ্র্যের দৃষ্টিতে মানুষের মূল্য ও মর্যাদা নিরূপণ করতো। তাদের ধারণা ছিল, যারা দুনিয়ায় প্রচুর পরিমাণ আরাম আয়েশের সামগ্ৰী লাভ করছে তারা যতই পথভ্রষ্ট ও অসৎকর্মশীল হোক না কেন তারা আল্লাহর প্রিয়। আর অভাবী ও দারিদ্র পীড়িতরা যতই সৎ হোক না কেন তারা আল্লাহর অভিশপ্ত। এ ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করে বলা হচ্ছে, রিযিক কমবেশী হবার ব্যাপারটা আল্লাহর অন্য নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট। সেখানে অন্যান্য অসংখ্য প্রয়োজন ও কল্যাণ-অকল্যাণের প্রেক্ষিতে কাউকে বেশী ও কাউকে কম দেয়া হয়।

এটা এমন কোন মানদণ্ড নয় যার ভিত্তিতে মানুষের নৈতিক ও মানসিক সৌন্দর্য ও কদর্যতার ফায়সালা করা যেতে পারে। মানুষের মধ্যে কে চিন্তা ও কর্মের সঠিক পথ অবলম্বন করেছে এবং কে ভুল পথ, কে উন্নত ও সৎগুণাবলী অর্জন করেছে এবং কে অসৎগুণাবলী -এরি ভিত্তিতে

তাদের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের আসল মানদণ্ড নির্ধারণ হওয়া উচিত। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়টি আল্লাহ্ তাআলা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

نُسَارِعُ لَهُمْ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ , أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِۦ مِن مَّالٍ وَبَنِي
“তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্যস্বরূপ যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দান করি, তা দ্বারা তাদের জন্য সকল মংগল তুরান্বিত করছি? না, তারা বুঝে না।” [আল-মু'মিনূনঃ ৫৫ - ৫৬]

আয়াতের শেষে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার জীবনের যাবতীয় সামগ্রী যে আখেরাতের তুলনায় কিছুই নয় তা বর্ণনা করে বলেছেন যে, “দুনিয়ার জীবন তো আখিরাতের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ভোগমাত্র।” অন্যত্র এসেছে,
قُلْ مَتَـٰعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْـَٔاخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً
“বলুন, পার্থিব ভোগ সামান্য এবং যে মুত্তাকী তার জন্য আখেরাতই উত্তম। তোমাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও যুলুম করা হবে না।” [সূরা আন-নিসাঃ ৭৭]

আরো এসেছে,
وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ, بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا
“কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও, অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্ট এবং স্থায়ী।” [সূরা আল-আলাঃ ১৬ - ১৭]

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া হলো এমন যেন তোমাদের কেউ সমুদ্রে তার এই আঙ্গুল ঢুকিয়ে আনল”, তারপর তিনি নিজের তর্জনীর দিকে ইঙ্গিত করলেন। **[মুসলিমঃ ২৮৫৮]**

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ، حَاتِمٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ، قَالَ سَمِعْتُ مُسْتَوْرِدًا، أَخَا بَنِي فِهْرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ - وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبَّابَةِ - فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ " . وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا غَيْرَ يَحْيَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ أَخِي بَنِي فِهْرٍ وَفِي حَدِيثِهِ أَيْضًا قَالَ وَأَشَارَ إِسْمَاعِيلُ بِالإِبْهَامِ .

পরিচ্ছেদঃ ১৪. দুনিয়ার নশ্বরতা ও কিয়ামতের বর্ণনা

হাদিস একাডেমি নাম্বারঃ ৭০৮৯ , আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ২৮৫৮
৭০৮৯-(৫৫/২৮৫৮) আবূ বকর ইবনু আবু শাইবাহ, ইবনু নুমায়র, ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া, মুহাম্মাদ ইবনু রাফি, মুহাম্মাদ ইবনু হাতিম (রহঃ) ..... বানু ফিহর এর ভাই মুসতাওরিদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহর শপথ! ***ইহকাল-পরকালের তুলনায় অতটুকুই, যেমন তোমাদের কেউ তার এ আঙ্গুলটি সমুদ্রে পানিতে ভিজিয়ে দেখল যে, কতটুকু পরিমাণ এতে পানি লেগেছে। বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া এ সময় শাহাদাত আঙ্গুলের দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন।*** ইয়াহইয়া ছাড়া সকলের বর্ণনার মাঝেই আছে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এ কথা বলতে শুনেছি। আর আবূ উসামার বর্ণনাতেও أَخِي بَنِي فِهْرٍ শব্দ উল্লেখ রয়েছে। তাতে এ কথাও উল্লেখ আছে যে, ইসমাঈল বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৬৯৩৩, ইসলামিক সেন্টার ৬৯৯১)

অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক মরা কান ছোট ছাগলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি তা দেখিয়ে সাহাবায়ে কিরামকে বললেন, আল্লাহর শপথ! এ ছাগলটি যেমন তার মালিকের নিকট মূল্যহীন তেমনি দুনিয়ার মূল্য আল্লাহর নিকট তার চেয়েও সামান্য। [মুসলিমঃ ২৯৫৭]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ - عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلاً مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ فَمَرَّ بِجَدْىٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ ثُمَّ قَالَ " أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ " . فَقَالُوا مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَىْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ قَالَ " أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ " . قَالُوا وَاللَّهِ لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا فِيهِ لأَنَّهُ أَسَكُّ فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ فَقَالَ " فَوَاللَّهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ "
হাদিস একাডেমি নাম্বারঃ ৭৩০৮ , আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ২৯৫৭
৭৩০৮-(২/২৯৫৭) আবদুল্লাহ ইবনু মাসলামাহ্ ইবনু কা'নাব (রহঃ) ..... জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আলিয়াহ অঞ্চল থেকে মদীনায় আসার পথে এক বাজার দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এ সময় রসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উভয় পাশে বেশ লোকজন ছিল। যেতে যেতে তিনি ক্ষুদ্র কান বিশিষ্ট একটি মৃত বকরীর বাচ্চার পাশ দিয়ে যেতে তার কাছে গিয়ে এর কান ধরে বললেন, তোমাদের কেউ কি এক দিরহাম দিয়ে এটা ক্রয় করতে আগ্রহী। তখন উপস্থিত লোকেরা বললেন, কোন কিছুর বদৌলতে আমরা এটা নিতে আগ্রহী নই এবং এটি নিয়ে আমরা কি করব? তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ বিনা পয়সায় তোমরা কি সেটা নিতে আগ্রহী? তারা বললেন, এ যদি জীবিত হত তবুও তো এটা দোষী। কেননা এর কান হচ্ছে ছোট ছোট। আর এখন তো সেটা মৃত, আমরা কিভাবে তা গ্রহণ করব? অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! এ তোমাদের কাছে যতটা নগণ্য, আল্লাহর কাছে দুনিয়া এর তুলনায় আরও বেশি নগণ্য। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৭১৫০, ইসলামিক সেন্টার ৭২০২)
শিক্ষা:
মুমিনদের গুণাবলী, তাদের প্রতিদান, পার্থিব জীবন স্থায়ীভাবে এবং কার্যকর রিযিক বন্টনের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।এই আয়াতের প্রধান শিক্ষাগুলো
:১. উল্লেখিত গুণাবলী (আয়াত ২২):সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য: মুমিনরা আল্লাহর ভয়ংকর আযাব থেকে সতর্ক থাকবে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য বিপদে-আপদে ধৈর্য ধরে রাখবে। তারা নামাজ আদায় করবে। গোপনে দান: আল্লাহ যে রিযিক দিয়েছেরন, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করে। তারা দুর্ব্যহার বা মন্দের বিষয়ে খারাপ ব্যবহার না করে, ভালো ব্যবহার করে মন্দকে দূর করে।

২. পরকালের সুসংবাদ ও স্থায়ী আবাস (আয়াত ২২-২৪):যারা ভালো মান অর্জন করবে, তাদের জন্য পরকালে জান্নাত বা "চিরস্থায়ী জান্নাত" রয়েছে। তাদের জন্য রয়েছে আদন জান্নাত, যেখানে তারা নিজেরা খুঁজে পাবে এবং তাদের পূর্ব পুরুষ, স্বামী-স্ত্রী ও নারীদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, তারা সেখানে দেখতে পাবে। ফেরেশতারা তাদের স্বাগত জানাবে এবং বলবে, "তোমাদের সকলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক; কতই না সুন্দর এই পরিণাম"।

৩. অমান্যকারী পরিণাম (আয়াত ২৫):যারা প্রতি কর্মশ্রুতি (অঙ্গীকার) ভঙ্গ করে, আল্লাহর সম্পর্কে (আত্মতা ও জ্ঞান) অটুটীয় যে নির্দেশক তা আমি এবং স্পষ্টভাবে ফিতনা ফাসাদ করে, তাদের জন্য রয়েছে লানত (অভিসম্পাত) এবং জাহান্নাম।

৪. রিযিক বন্টন ও দুনিয়ার বাস্তবতা (আয়াত ২৬):রিযিকের বর্ণনা আল্লাহ: আল্লাহর জন্য ইচ্ছা রিযিক দেন (প্রাচুর্য) এবং যার জন্য ইচ্ছা তা সীমিত বাকীর্ণ দেন।দুনিয়ার নগণ্যতা: মানুষ পাব জীবন ধোন-সম্পদ উল্লসিত হয়, কিন্তু সঠিক দৃষ্টিতে আতরের আমাদের দুনিয়ার জীবন নগণ্য, ক্ষণস্থায়ী ভোগ্যতা।

মূল শিক্ষা: এই আয়াতের মূল শিক্ষা, জ্ঞানদারদের উচিত সব পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধরে রাখা, সতর্ক সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট স্থায়ী এবং দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মত্ত হওয়া আখিরাতের বেঁচে থাকা না হওয়া।

৪ হেদায়াত

লেখক-সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, অনুবাদক-মাওলানা আব্দুর রহিম

বই পরিচিতি: ১৯৫১ সালের ১৩ই নভেম্বর করাচিতে জামায়াতের বার্ষিক সম্মেলনের প্রদত্ত বক্তব্য।

ভাষণে যে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে:

আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্ক:

১. আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে আল্লাহরপ্রতি ঈমান।
২. ইবাদাতের বেলায় আল্লাহর সাথে নিবিড়তর সম্পর্ক স্থাপন।
৩. নৈতিক চরিত্রে আল্লাহরপ্রতি ভয় পোষণ এবং আচার-ব্যবহার ও লেনদেনের বেলায় আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভ করাকেই প্রাধান্য দেয়া দরকার।

আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের অর্থ:

১. নিজ জীবনের সকল কিছু একমাত্র আল্লাহর জন্য।
২. সকল কাজে একমাত্র আল্লাহকে ভয় করা।
৩. বন্ধুত্ব, শত্রুতা, লেনদেন শুধু তার সন্তুষ্টির জন্য।
৪. সকল অবস্থায় শুধু তার উপর ভরসা করা।
৫. নিজের চলার পথকে শুধু আল্লাহর নির্দেশিত সীমায় রাখা।

আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির উপায়: ২টি

১. চিন্তা ও গবেষনা:

ক) নিয়মিত কোরআন,হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন ও এবং সম্পর্কের ধারনা লাভ।

খ) সম্পর্কের অনুভূতি লাভ এবং সার্বক্ষনিক স্মরন।

গ) নিজ অবস্থায় আত্নসমালোচনা ;সর্ম্পকের মান/ দাবী।

২. বাস্তব কাজের পন্থা:

ক) সঠিক পথে চলার তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

খ) নিজের আকর্ষনের মান পর্যালোচনা, অভাব দেখা মাত্র পূরনের চেষ্টা করা।

গ) অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগ করে সৎ সঙ্গ লাভ।

ঘ) নিজের চেষ্টা ব্যতিত গুনের হ্রাস বৃদ্ধি সম্ভব নয়।

আল্লাহর সাথে সম্পর্কের বিকাশ সাধনের উপকরণ:

১. সালাত ২. আল্লাহর যিকর ৩. সাওম ৪. আল্লাহর পথে অর্থ খরচ করা

আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্ক যাচাই করার উপায়:

স্বপ্নযোগে অথবা কাশফ, কারামত যাহির করার প্রয়োজন নেই, অন্তরই যথেষ্ট।

যা বিশ্লেষন করতে হবে:

১. আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তি পূরন করা।

২. আল্লাহর দেয়া আমানত রক্ষা করা

<u>৩. নিজের স্বার্থে আঘাত লাগলে মনে কতটুকু কষ্ট পায়, আর আল্লাহর বিষয়ে কেউ নাফরমানি করলে মনে কতটুকু কষ্ট পায়।</u>

৪. খোদাদ্রোহীদের তৎপরতা কতটুকু যাতনা সৃষ্টি করে?

বড় কারামত:

১. চরম জাহেলিয়াতের মধ্যে অবস্থান করে তাওহীদের নিগুঢ় তত্ব অনুধাবন, অনুধাবন এটাই কারামত।

২. আল্লাহর পথে অটল থাকাই মুমিনের জন্য সাফল্যের সংবাদ।

আখেরাতকে অগ্রাধিকার দান: একমাত্র আখেরাতের সাফল্য আমাদের লক্ষ্য।

আখেরাতের চিন্তার লালন:

সার্বক্ষনিক অনুভূতির পন্থা -২টি।

১. চিন্তা ও আদর্শমূলক:

ক) অর্থবুঝে কালামে পাক অধ্যয়ন:

কুরআনের প্রতি পৃষ্ঠায় আখেরাত।

আখেরাতের বিস্তারিত বিবরণ।

স্থায়ী বাসভূমির জন্য অস্থায়ী বাসভূমিতে প্রস্তুতি গ্রহন।

খ) হাদীস অধ্যয়ন ও অনুধাবন:

কুরআনের বিস্তারিত রূপ।

রাসুল সা: কে জানার উপায়।

রাসুল সা: ও সাহাবীদের ত্যাগ স্মরন

গ) কবর জিয়ারত: মৃত্যুকে স্মরন।

পারস্পরিক সংশোধন ও এর পন্থা:

পারস্পরিক সমালোচনার সঠিক পন্থা:

- সকল স্থানে ও সকল সময়ে আলোচনা করা চলবে না বরং বিশেষ বৈঠকে আমীরের প্রস্তাব কিংবা অনুমতিক্রমেই তা করা যেতে পারে।
- সমালোচনাকারী সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালাকে হাযির-নাযির জেনে নিজের মনের অবস্থা সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করে দেখবেন যে, তিনি সততা ও শুভাকাংক্ষীর বশবর্তী হয়েই সমালোচনা করছেন, না কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ এর মূলে সক্রিয় রয়েছে। প্রথমোক্ত

অবস্থায় নি:সন্দেহে সমালোচনা করা যেতে পারে, অন্যথায় কোনপ্রকার উচ্চবাচ্য না করে নিজের অন্তর হতে এ কালিমা রেখা দূর করার জন্য তার সচেষ্ট হওয়া উচিত।

- সমালোচনার ভঙ্গী ও ভাষা এমন হওয়া উচিত, যা শুনেপ্রত্যেকেই বুঝতে পারবে যে, আপনি সত্যই সংশোধনের বাসনা পোষণ করছেন।
- সমালোচনার উদ্দেশ্যে কথা বলার পূর্বে আপনার অভিযোগের সমর্থনে কোন বাস্তব প্রমাণ আছে কিনা, তা অবশ্যই ভেবে দেখবেন। অহেতুক কারো বিরুদ্ধে কথা বলা অত্যন্ত কঠিন গুনাহ, এর ফলে সামাজিক জীবনে বিশৃংখলা দেখা দেয়।
- যে ব্যক্তির সমালোচনা করা হবে, তার অত্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে সমালোচকের বক্তব্য শ্রবণ করা এবং সততার সাথে তা ভেবে দেখা কর্তব্য। অভিযোগের যে অংশ সত্য, তা অকপটে স্বীকার করা এবং যে অংশ সত্য নয় তা যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা খন্ডন করা উচিত। সমালোচনা শুনে রাগান্বিত হওয়া অহংকার ও আত্মম্ভরিতার লক্ষণ।
- সমালোচনা এবং এর জবাবের ধারা সীমাহীনভাবে চলা উচিত নয়, কোন এতে একটি স্থায়ী বিরোধ ও কথা কাটাকাটির সূত্রপাত হতে পারে। আলোচনা শুধু উভয় পক্ষের বক্তব্য সুস্পষ্ট না হওয়া পর্যন্তই চলতে পারে। এরপরও যদি বিষয়টির মীমাংসা না হয়, তবে আলোচনা সেখানেই স্থগিত রাখুন, যেন উভয় পক্ষ ধীরস্থীরভাবে এবং শান্ত মনে নিজেদের বক্তব্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে।

আনুগত্য ও নিয়ম-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ:

জামায়াতের নেতৃবৃন্দেরপ্রতি উপদেশ:

ক) অহেতুক কর্তাগিরি বা প্রভুত্বের স্বাদ গ্রহন নয়। নম্র ও মধুর ব্যবহার দিয়ে কথা বলতে হবে।

খ) ব্যবহারের ত্রুটি কর্মীর মনে বিদ্রোহের জন্ম দিতে পারে।

গ) একই ধারা নয়, বরং অবস্থা, সুযোগ, সামর্থ বুঝে কাজ দিতে হবে।

মে-২১

কুরআন অধ্যয়ন: সূরা আল কাহফ (২৭ ও ২৮) নং আয়াত

وَٱتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰتِهِۦ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًا(27)
وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِىِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ
أَغْفَلْنَا قَلْبَهُۥ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمْرُهُۥ فُرُطًا 28.

হে নবী! আপনার রবের কিতাবের মধ্য থেকে যা কিছু আপনার ওপর অহি করা হয়েছে তা (হুবহু) শুনিয়ে দিন। তাঁর পরিবর্তনের অধিকার আপনার নেই, আর আপনি যদি তা করেন তাহলে আল্লাহর হাত থেকে নিস্কৃতি দানের জন্য কেউ নেই।
আর নিজের অন্তরকে তাদের দিকে সঙ্গলাভে নিশ্চিত করুন যারা নিজেদের রবের সন্তুষ্টির সন্ধানে সকাল-সাঁঝে তাঁকে ডাকে এবং কখনও তাদের কাছ থেকে দৃষ্টি ফিরাবেন না। আপনি কি পার্থিব পছন্দ করেন?
এমন কোন লোকের অনুগত্য করবেন না এবং যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করছি, যে নিজের প্রবৃত্তি দিয়ে কামনা বাসনার অনুসরণ করেছে এবং যার কর্মপদ্ধতি কখনো উগ্র, কখনো উদাসীন।

নামকরণ

প্রথম রুকূ'র ৯ আয়াত (أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَـٰبَ **ٱلْكَهْفِ** وَٱلرَّقِيمِ كَانُوا۟ مِنْ ءَايَـٰتِنَا عَجَبًا) থেকে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে । এ নাম দেবার মানে হচ্ছে এই যে, এটা এমন একটা সূরা যার মধ্যে আল কাহফ শব্দ এসেছে ।

নাযিলের সময় কাল

এখান থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কী জীবনের তৃতীয় অধ্যায়ে অবতীর্ণ সূরাগুলো শুরু হচ্ছে । মক্কী জীবনকে আমি চারটি বড় বড় অধ্যায়ে ভাগ করেছি । সূরা আন ' আমের ভূমিকায় এর বিস্তারিত বিবরণ এসে গেছে । এ বিভাগ অনুযায়ী তৃতীয় অধ্যায়টি প্রায় ৫ নববী সন থেকে শুরু হয়ে ১০ নববী সন পর্যন্ত বিস্তৃত । পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোর মোকবিলায় এ অধ্যায়টির বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে, পূর্ববর্তী অধ্যায় দু'টিতে কুরাইশরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লাম এবং তাঁর আন্দোলন ও জামায়াতকে বিপর্যস্ত করার জন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উপহাস, ব্যাংগ বিদ্রূপ, আপত্তি, অপবাদ, দোষারোপ, ভীতি প্রদর্শন, লোভ দেখানো ও বিরুদ্ধে প্রচারণার ওপর নির্ভর করছিল । কিন্তু এ তৃতীয় অধ্যায় এসে তারা জুলুম, নিপীড়ন, মারধর ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টির অস্ত্র খুব কড়াকড়িভাবে ব্যবহার করে । এমনকি বিপুল সংখ্যক মুসলমানকে দেশ ত্যাগ করে হাবশার দিকে যেতে হয় । আর বাদবাকি মুসলমানদের এবং তাদের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

এবং তাঁর পরিবার ও বংশের লোকদের আবু তালেব গিরি গুহার পূর্ণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বয়কটের মধ্যে অবরুদ্ধ জীবন যাপন করতে হয় । তবুও এ যুগে আবু তালেব ও উমমূল মু'মিনীন হযরত খাদীজার (রা) ন্যায় দু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রভাবে ফলে কুরাইশদের দু'টি বড় বড় শাখা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পৃষ্ঠপোষকতা করছিল । ১০ নববী সনে এ দু'জনের মৃত্যুর সাথে সাথেই এ অধ্যায়টির সমাপ্তি ঘটে । এরপর শুরু হয় চতুর্থ অধ্যায় । এ শেষ অধ্যায়ে মুসলমানদের মক্কায় জীবন যাপন অসম্ভব হয়ে পড়ে । এমনকি শেষ পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমস্ত মুসলমানদের নিয়ে মক্কা ত্যাগ করতে হয় ।

সূরা কাহফের বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করলে বুঝা যায়, মক্কী যুগের এ তৃতীয় অধ্যায়ের শুরুতেই এ সূরাটি নাযিল হয়ে থাকবে । এ সময় জুলুম, নিপীড়ন, বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল । ঠিকই কিন্তু তখনো মুসলমানরা হাবশায় হিজরত করেনি । তখন যেসব মুসলমান নির্যাতিত হচ্ছিল তাদেরকে আসহাবে কাহফের কাহিনী শুনানো হয়, যাতে তাদের হিম্মত বেড়ে যায় এবং তারা জানতে পারে যে, ঈমানদাররা নিজেদের ঈমান বাঁচাবার জন্য ইতিপূর্বে কি করেছে ।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

মক্কার মুশরিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরীক্ষা নেবার জন্য আহলি কিতাবদের পরামর্শক্রমে তাঁর সামনে যে তিনটি প্রশ্ন করেছিল তার জবাবে এ সূরাটি নাযিল হয় । প্রশ্ন তিনটি ছিল: এক, আসহাবে কাহফ কারা ছিলেন? দুই, খিযিরের ঘটনাটি এবং তার তাৎপর্য কি ? ১ তিন, যুলকারনাইনের ঘটনাটি কি ? এ তিনটি কাহিনীই খৃস্টান ও ইহুদীদের ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত ছিল । হিজাযে এর কোন চর্চা ছিল না । তাই আহলি কিতাবরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সত্যিই কোন গায়েবী ইলমের মাধ্যম আছে কিনা তা জানার জন্যেই এগুলো নির্বাচন করেছিল । কিন্তু আল্লাহ তাঁর নবীর মুখ দিয়ে কেবল এগুলোর পূর্ণ জবাব দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং এ সংগে এ ঘটনা তিনটিকে সে সময় মক্কায় কুফর ও ইসলামের মধ্যে যে অবস্থা বিরাজ করছিল তার সাথে পুরোপুরি খাপ খাইয়ে দিয়েছেন ।

১. হাদীসে বলা হয়েছে, দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল রূহ সম্পর্কে । বনী ইসরাঈলের ১০ রুকূতে এর জবাব দেয়া হয়েছে । কিন্তু সূরা কাহফ ও বনী ইসরাঈলের নাযিলের সময়কালের মধ্যে রয়েছে কয়েক বছরের ব্যবধান । আর সূরা কাহফে দু'টির জায়গায় তিনটি কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে । তাই আমার মতে, দ্বিতীয় প্রশ্নটি হযরত খিযির সম্পর্কেই ছিল, রূহ সম্পর্কে নয় । খোদ কুরআনেই এমনি একটি ইশারা আছে, তা থেকে আমার এ অভিমতের প্রতি সমর্থন পাওয়া যাবে ।

এক: আসহাবে কাহফ সম্পর্কে বলেন, এ কুরআন যে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করছে তারা ছিলেন তারই প্রবক্তা । তাদের অবস্থা মক্কার এ মুষ্টিমেয় মজলুম মুসলমানদের অবস্থা থেকে এবং তাদের জাতির মনোভাব ও ভূমিকা মক্কার কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের ভূমিকা থেকে ভিন্নতর ছিল না । তারপর এ কাহিনী থেকে ঈমানদারদেরকে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, যদি কাফেররা সীমাহীন ক্ষমতা ও আধিপত্যের অধিকারী হয়ে গিয়ে থাকে তাদের জুলুম -নির্যাতনের ফলে সমাজে একজন মুমিন শ্বাসগ্রহণ করারও অধিকার হারিয়ে বসে তবুও তার বাতিলের সামনে মাথা নত না করা উচিত বরং আল্লাহর ওপর ভরসা করে দেশ থেকে বির হয়ে যাওয়া উচিত । এ প্রসংগে আনুসংগিকভাবে মক্কার কাফেরদেরকে একথাও বলা হয়েছে যে, আসহাবে কাহফের কাহিনী আখেরাত বিশ্বাসের নির্ভুলতার একটি প্রমাণ । যেভাবে আল্লাহ তা'আলা আসাহবে কাহফের সুদীর্ঘকাল মৃত্যু নিদ্রায় বিভোর করে রাখার পর আবার জীবিত করে তোলেন ঠিক তেমনিভাবে মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন মেনে নিতে তোমরা অস্বীকার করলে কি হবে, তা আল্লাহর ক্ষমতার বাইরে নয় ।

দুই: মক্কার সরদার ও সচ্ছল পরিবারের লোকেরা নিজেদের জনপদের ক্ষুদ্র নও মুসলিম জামায়াতের ওপর যে জুলুম নিপীড়ন চালাচ্ছিল এবং তাদের সাথে ঘৃণা ও লাঞ্ছনাপূর্ণ আচরণ করছিল আসহাবে কাহফের কাহিনীর পথ ধরে সে সম্পর্কে আলোচনা শুরু করা হয়েছে । এ প্রসংগে একদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, এ জালেমদের সাথে কোন আপোস করবে না এবং নিজের গরীব সাথীদের মোকাবিলায় এ বড় লোকদের মোটেই গুরুত্ব দেবে না । অন্যদিকে এ ধনী ও সরদারদেরকে এ মর্মে নসীয়ত করা হয়েছে যে, নিজেদের দু'দিনের আয়েশী জীবনের চাকচিক্য দেখে ভুলে যেয়ো না বরং চিরন্তন ও চিরস্থায়ী কল্যাণের সন্ধান করো ।

তিন: এ আলোচনা প্রসংগে খিযির ও মূসার কাহিনীটি এমনভাবে শুনিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তাতে কাফেরদের প্রশ্নের জবাবও এসে গেছে এ সংগে মুমিনদরেকেও সরবরাহ করা হয়েছে সান্তনার সরঞ্জাম । এ কাহিনীতে মূলত যে শিক্ষা দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, যেসব উদ্দেশ্য ও কল্যাণকারিতার ভিত্তিতে আল্লাহর এ বিশাল সৃষ্টিজগত চলছে তা যেহেতু তোমাদের দৃষ্টির অন্তরালে রয়েছে তাই তোমরা কথায় কথায় অবাক হয়ে প্রশ্ন করো, এমন কেন হলো ? এ কি হয়ে গেলো । এ তো বড়ই ক্ষতি হলো ! অথচ যদি পর্দা উঠিয়ে দেয়া হয় তাহলে তোমরা নিজেরাই জানতে পারবে এখানে যা কিছু হচ্ছে ঠিকই হচ্ছে এবং বাহ্যত যে জিনিসের মধ্যে ক্ষতি দেখা যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত তার ফলশ্রুতিতে কোন না কোন কল্যাণই দেখা যায় ।

চার: এরপর যুলকারনাইনের কাহিনী বলা হয় । সেখানে প্রশ্নকারীদেরকে এ শিক্ষা দেয়া হয় যে, তোমরা তো নিজেদের এ সামান্য সরদারীর মোহে অহংকারী হয়ে উঠেছো অথচ যুলকারণাইনকে দেখো । কত বড় শাসক । কত জবরদস্ত বিজেতা । কত বিপুল বিশাল উপায় উপকরণের মালিক হয়েও নিজের স্বরূপ ও পরিচিত বিস্মৃত হননি । নিজের স্রষ্টার সামনে সবসময় মাথা হেঁট করে থাকতেন । অন্যদিকে তোমরা নিজেদের এ সামান্য পার্থিব বৈভব ও ক্ষেত খামারের শ্যামল শোভাকে চিরস্থায়ী মনে করে বসেছো । কিন্তু তিনি দুনিয়ার সবচেয়ে মজবুত ও সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা প্রাচীর নির্মাণ করেও মনে করতেন সার্বিবস্থায় একমাত্র আল্লাহর ওপরই নির্ভর করা যেতে পারে, এ প্রাচীরের ওপর

নয় । আল্লাহ যতদিন চাইবেন ততদিন এ প্রাচীর শত্রুদের পথ রোধ করতে থাকবে এবং যখনই তাঁর ইচ্ছা ভিন্নতর হবে তখনই এ প্রাচীরে ফাটল ও গর্ত ছাড়া আর কিছুই থাকবে না ।

এভাবে কাফেরদের পরীক্ষামূলক প্রশ্নগুলো তাদের ওপরই পুরোপুরি উল্টে দেবার পর বক্তব্যের শেষে আবার সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, বক্তব্য শুরু করার সময় যা বলা হয়েছিল । অর্থাৎ তাওহীদ ও আখেরাত হচ্ছে পুরোপুরি সত্য । একে মেনে নেয়া, সে অনুযায়ী নিজেদের সংশোধন করা এবং আল্লাহর সামনে নিজেদের জবাবদিহি করতে হবে বলে মনে করে দুনিয়ায় জীবন যাপন করার মধ্যেই তোমাদের নিজেদের মংগল । এভাবে না চললে তোমাদের নিজেদের জীবন ধ্বংস হবে এবং তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপও নিষ্ফল হয়ে যাবে ।

ব্যাখ্যাঃ
২৭
কাফেরগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দাবী করত, আপনি আমাদের ইচ্ছা ও বিশ্বাস অনুযায়ী এ কুরআনকে পরিবর্তন করে দিন। তা করলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনতে প্রস্তুত আছি। পূর্বে সূরা ইউনুসে (১০ : ১৫) তাদের এ দাবীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত তাদেরকে শোনানোর লক্ষ্যেই আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্ভাষণ করে এ আয়াতের বক্তব্য পেশ করেছেন। এতে বলা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার কালামে রদবদল করার কোন এখতিয়ার কারও নেই। কেউ যদি এমনটা করে, তবে আল্লাহ তাআলার আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সে কোনও আশ্রয়স্থল পাবে না।
তাফসীরে মাআ'রিফুল কুরআন

এবং (আপনার কাজ এতটুকু যে) আপনার প্রতি আপনার পালনকর্তার যে কিতাব নাযিল করা হয়েছে, তা (লোকদের সামনে) পাঠ করুন। (এর বেশি চিন্তা করবেন না যে, বড় লোকেরা যদি ইসলামের বিরোধিতা করতে থাকে, তবে ইসলামের উন্নতি কিভাবে হবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং এর ওয়াদা করেছেন। এবং) তাঁর বাক্যকে (অর্থাৎ ওয়াদাসমূহকে) কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। (অর্থাৎ সারা বিশ্বের বিরোধিরা মিলেও আল্লাহ্কে ওয়াদা পূর্ণ করা থেকে নিবৃত্ত করতে পারবে না। আল্লাহ্ নিজে যদিও পরিবর্তন করতে সক্ষম, কিন্তু তিনি পরিবর্তন করবেন না।) এবং (যদি আপনি আল্লাহর বিধান বর্জন করে বড়লোকদের মনোরঞ্জন করেন, তবে) আপনি আল্লাহ্ ব্যতীত কখনই কোন আশ্রয়ের স্থান পাবেন না। [শরীয়তের প্রমাণাদির ভিত্তিতে আল্লাহ্ বিধান বর্জন করা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু এখানে তাকীদের জন্য অসম্ভবকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে একথা বলা হয়েছে]। এবং (আপনাকে যেমন কাফিরদের ধনী ও বড়লোকদের দিক থেকে বেপরোয়া থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে, তেমনি মুসলমান নিঃস্বদের অবস্থার প্রতি আরও মনোযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে আদেশ করা হচ্ছে। সুতরাং) আপনি নিজেকে তাদের সাথে (উঠাবসায়) আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল-সন্ধ্যায় (অর্থাৎ সব সময়) তাদের পালনকর্তার ইবাদত শুধু তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করে (কোন পার্থিব উদ্দেশ্যে নয়) এবং পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে আপনি তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি (অর্থাৎ মনোযোগ) ফিরিয়ে নেবেন না। (পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে--অর্থ বড়লোকেরা মুসলমান হয়ে গেলে ইসলামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে ধন-সম্পদ দ্বারা ইসলামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় না, বরং আন্তরিকতা ও আনুগত্যের দ্বারা বৃদ্ধি পায়। দরিদ্র মুসলমানদের মধ্যেও আন্তরিকতা ও আনুগত্য থাকলে তাতে ইসলামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। (গরীব মুসলমানদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে দেওয়া সম্পর্কে) এরূপ ব্যক্তির আবদার মানবেন না, যার মনকে আমি (তার হঠকারিতার শাস্তিস্বরূপ) আমার স্মরণ থেকে গাফিল করে রেখেছি। সে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং তার এ অবস্থা (অর্থাৎ প্রবৃত্তির অনুসরণ) সীমা অতিক্রম করছে। আপনি (সে কাফির সরদারদেরকে বলে দিনঃ (এ) সত্য (ধর্ম) তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব যার ইচ্ছা, বিশ্বাস স্থাপন করুক আর যার ইচ্ছা, কাফির থাকুক। (আমার কোন লাভ ক্ষতি নেই। লাভ ক্ষতি স্বয়ং তারই। তা এই যে) নিশ্চয় আমি জালিমদের জন্য (দোযখের) আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বলয় তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে। (অর্থাৎ বলয়গুলোও আগুনের তৈরি। হাদীসে রয়েছে, তারা এই বলয় অতিক্রম করতে পারবে না।) যদি তারা (পিপাসায় কাতর হয়ে) পানীয় প্রার্থনা করে, তবে এমন পানীয় দ্বারা তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করা হবে, যা (কুশ্রী হওয়ার দিক দিয়ে) তেলের গাদের মত হবে (এবং এত উত্তপ্ত হবে যে, কাছে আনতেই) মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। (ফলে মুখমণ্ডলের চামড়া উঠে যাবে। হাদীসে তাই বলা হয়েছে।) কতই না নিকৃষ্ট হবে সে পানীয় এবং কতই না মন্দ জায়গা হবে সে দোযখ! (এ হচ্ছে বিশ্বাস স্থাপন না করার ক্ষতি এখন বিশ্বাস স্থাপন করার লাভ বর্ণিত হচ্ছে–) নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, আমি সৎ কর্মীদের প্রতিদান নষ্ট করি না। এমন লোকদের জন্য সর্বদা বসবাসের বাগান রয়েছে। তাদের (বাসস্থানের) তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে নহর। তাদেরকে সেখানে স্বর্ণ-কংকনে অলংকৃত করা হবে এবং তারা পাতলা ও মোটা রেশমের সবুজ পরিধেয় পরিধান করবে (এবং) সেখানে সিংহাসনে হেলান দিয়ে উপবেশন করবে। কি চমৎকার প্রতিদান এবং (জান্নাত) কতই না উত্তম আশ্রয়।

দাওয়াত ও তাবলীগের বিশেষ রীতিঃ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ এ আয়াতের শানেনুযূল প্রসংগে কয়েকটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সবগুলোই আয়াত অবতরণের কারণ হতে পারে। বগভী বর্ণনা করেন, মক্কার সরদার ওয়ায়না ইবনে হিসন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে

উপস্থিত হয়। তখন তাঁর কাছে হযরত সালমান ফারসী (রা) উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন দরিদ্র সাহাবীদের অন্যতম। তাঁর পোশাক ছিন্ন এবং আকার-আকৃতি ফকীরের মত ছিল। তাঁর মত আরও কিছুসংখ্যক দরিদ্র ও নিঃস্ব সাহাবী মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। ওয়ায়না বললঃ এই লোকদের কারণেই আমরা আপনার কাছে আসতে পারি না এবং আপনার কথা শুনতে পারি না। এমন ছিন্নমূল মানুষের কাছে আমরা বসতে পারি না। আপনি হয় তাদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে রাখুন, না হয় আমাদের জন্য আলাদা এবং তাদের জন্য আলাদা মজলিস অনুষ্ঠান করুন।

ইবনে মরদুয়াইহ্, আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, উমাইয়া ইবনে খলফ জমহী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পরামর্শ দেন যে, দরিদ্র, নিঃস্ব ও ছিন্নমূল মুসলমানদেরকে আপনি নিজের কাছে রাখবেন না, বরং কুরাইশ সরদারদেরকে সাথে রাখুন। এরা আপনার ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেলে ধর্মের খুব উন্নতি হবে।

এ ধরনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়–এতে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। শুধু নিষেধই নয়–আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ অর্থাৎ আপনি নিজেকে তাদের সাথে বেঁধে রাখুন। এর অর্থ এরূপ নয় যে, কোন সময় পৃথক হবেন না। বরং উদ্দেশ্য এই যে, সম্পর্ক ও মনোযোগ তাদের প্রতি নিবদ্ধ রাখুন। কাজেকর্মে তাদের কাছ থেকেই পরামর্শ নিন। এর কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে, তারা সকাল-সন্ধ্যায় অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহর ইবাদত ও যিকির করে। তাদের কার্যকলাপ একান্তভাবেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিবেদিত। এসব অবস্থা আল্লাহর সাহায্য ডেকে আনে।

আল্লাহর সাহায্য তাদের জন্যই আগমন করে। ক্ষণস্থায়ী দুরবস্থা দেখে অস্থির হবেন না পরিণামে সাহায্য ও বিজয় তারাই লাভ করবে।

কুরাইশ সরদারদের পরামর্শ কবূল না করার কারণও আয়াতের শেষে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের মন আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল এবং তাদের সমস্ত কার্যকলাপ তাদের খেয়াল-খুশির অনুসারী। এসব অবস্থা মানুষকে আল্লাহর রহমত ও সাহায্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, তাদের জন্য আলাদা মজলিস করার পরামর্শটি তো গ্রহণযোগ্য ছিল। এর ফলে তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো এবং তাদের পক্ষে তা কবূল করা সহজ হতো। কিন্তু এ ধরনের মজলিস বণ্টনের মধ্যে অবাধ্য ধনীদের প্রতি বিশেষ সম্মান দেখানো হতো। ফলে দরিদ্র মুসলমানদের মন ভেঙ্গে যেত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তা পছন্দ করেন নি এবং এ ব্যাপারে পার্থক্য না করাকেই দাওয়াত ও প্রচারের মূলনীতি স্থির করেছেন।

জান্নাতীদের অলংকারঃ يُحَلَّوْنَ فِيهَا এ আয়াতে জান্নাতী পুরুষদেরকেও স্বর্ণের কংকন পরিধান করানোর কথা বলা হয়েছে। এতে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, অলংকার পরিধান করা পুরুষদের জন্য যেমন শোভনীয় নয়, তেমনি সৌন্দর্য ও সাজসজ্জাও নয়। তাদেরকে কংকন পরানো হলে তারা বিশ্রী হয়ে যাবে।

উত্তর এই যে, শোভা ও সৌন্দর্য প্রথা ও প্রচলনের অনুসারী। এক দেশে যাকে শোভা ও সৌন্দর্য মনে করা হয়, অন্য দেশে প্রায়ই তাকে ঘৃণার বস্তু বলে বিবেচনা করা হয়। এর বিপরীতও হয়ে থাকে। এমনিভাবে একসময় কোন বিশেষ বস্তু সৌন্দর্য বলে বিবেচিত হয়, অন্য সময়ে তাকেই দোষ মনে করা হয়। জান্নাতে পুরুষদের জন্যও অলংকার এবং রেশমী বস্তু শোভা ও সৌন্দর্য সাব্যস্ত করা হলে তা কারও কাছে অপরিচিত ঠেকবে না। এটা শুধু দুনিয়ার আইন যে, এখানে পুরুষদের জন্য স্বর্ণের কোন অলংকার এমনকি স্বর্ণের আংটি, ঘড়ির চেইন ইত্যাদিও ব্যবহার করা জায়েয নয়। এমনিভাবে রেশমী বস্ত্রও পুরুষদের জন্য জায়েয নয়। কিন্তু জান্নাত পৃথক এক জগৎ। সেখানে এ আইন থাকবে না।

সূরা কাহাফের ২৭ ও ২৮ নম্বর আয়াত দুটিতে মূলত আল্লাহর বাণীর অটলতা এবং মুমিনদের সঙ্গে ধৈর্যশীল থাকার ও দুনিয়ার মোহ থেকে দূরে থাকার গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে।এ আয়াত দুটি থেকে প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষাগুলো নিচে দেওয়া হলো:

১. আল্লাহর বাণীর অটলতা ও ওহীর অনুসরণ২৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাব (কুরআন) থেকে যা ওহী করা হয়েছে তা পড়ে শুনানোর নির্দেশ দিয়েছেন।শিক্ষা: আল্লাহর বাণীর কোনো পরিবর্তনকারী নেই। সত্য ও হেদায়েতের জন্য ওহীর জ্ঞানই চূড়ান্ত মানদণ্ড।আশ্রয়: আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো আশ্রয়স্থল নেই। তাই সর্বাবস্থায় তাঁর দিকেই ফিরে আসতে হবে।

২. সৎ সঙ্গ ও ধৈর্য ধারণ, ২৮ নম্বর আয়াতে নবী (সা.)-কে এবং তাঁর মাধ্যমে মুমিনদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেই সব লোকেদের সঙ্গে ধৈর্য সহকারে থাকতে যারা সকাল-সন্ধ্যা তাদের পালনকর্তাকে স্মরণ করে এবং তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে।শিক্ষা: যারা আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকে, তারা আর্থিকভাবে দরিদ্র হলেও তাদের সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত নয়।
৩. দুনিয়ার চাকচিক্য পরিহারদুনিয়ার জীবনের চাকচিক্য বা জৌলুসের লোভে পড়ে মুখ ফিরিয়ে না নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।শিক্ষা: ধন-সম্পদ বা পদমর্যাদার মোহে পড়ে দরিদ্র ও নিষ্ঠাবান মুমিনদের অবহেলা করা যাবে না।
৪. নফসের দাসত্ব ও গাফিলতি থেকে বাঁচার সতর্কতাযে ব্যক্তির অন্তর আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ এবং যে নিজের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে, তাকে অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।শিক্ষা: যাদের জীবন লক্ষ্যহীন এবং যারা আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত, তাদের সঙ্গ বা আদর্শ গ্রহণ করা ঈমানের জন্য ক্ষতিকর।সারসংক্ষেপে, এই আয়াতগুলো আমাদের কুরআন আঁকড়ে ধরা, আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাদের সাহচর্যে থাকা এবং দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী মোহে না পড়ে আখেরাতের পথে অবিচল থাকার শিক্ষা দেয়।

বই নোটঃ ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি

লেখকঃ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রা:), অনুবাদ-মাওলানা আব্দুর রহীম।

ইসলামী আন্দোলনঃ

মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ হতে গায়রুল্লাহর প্রভুত্ব উৎখাত করে আল্লাহর কর্তৃত্ব ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নেতৃত্বপ্রতিষ্ঠার জন্য যে সর্বাত্বক চেষ্টা ওপ্রচেষ্টা তাকে ইসলামী আন্দোলন বলে।

নৈতিকতাঃ নীতি মানার যেটি অনুভূতি সেটি নৈতিকতা। মানবীয় চরিত্রের যে গুন যা তাকে সঠিক পথে চলতে উৎসাহিত করে।
ভিত্তিঃ যার উপর ভিত্তি করে কোন কিছু সংস্থাপিত হয়।

মানব সমাজে অশান্তির মূল কারণ:-

১. বর্তমান সমাজের নেতৃত্ব সৎ নয়
২. এ মূল সমস্যা জনগন উপলব্ধি করতে পরেনা
৩. অনৈক্য ও ভাঙ্গন
৪. সত্য ও সত্যপ্রিয় মানুষ অনেক, কিন্তু আসল সত্য প্রিয় মানুষের সংখ্যা কম
৫. সত্যপ্রিয় লোক থাকলেও ক্ষমতায় নেই।

নেতৃত্বর গুরুত্বঃ

১. নেতা হচ্ছে যে কোন কার্যের প্রকৃত ভূমিকা পালনকারী।
২. নেতাই ভাঙ্গা ও গড়ার মৌলিক পরিকল্পনাকারী।
৩. নেতা তার অধীনস্ত কর্মীদের অনুসরনীয় ব্যক্তি।
৪. নেতা অসৎ হলে পাপ পঙ্কিলতা দূর হয়ে সৎ পথে চলা হয়।
৫. নেতা সৎ হলে খোদাকেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনার দরুন পাপ নি:শেষ না হলে সমাজ সহজে বিকশিত হতে পারে না।

নেতার ব্যাপারে খোদার নির্দেশ/ ইসলামের মূল লক্ষ্যঃ

১. সব মানুষ আল্লাহর গোলামী করবে।
২. খোদারপ্রদত্ত বিধানই কর্মীদের চলার পথ।
৩. দুনিয়া হতে সকল অশক্তি ও বিপদ দূর করতে হবে।
৩. উপরোক্ত কাজের নিয়ামক নেতার, কর্মী বা জনশক্তির নয়।
৪. ত্র কাজটি পারে ত্রকমাত্র ইসলামী নেতৃত্ব।
৫. ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না থাকলে সামগ্রিক প্রতিষ্ঠার বাতিল নেতৃত্ব উৎখাত করে ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
৬. সুতরাং ইসলামের মূল লক্ষ্য নেতৃত্বের আমূল পরিবর্তন।

মানবিক বা নৈতিক দিকঃ ২টি

* ১. মৌলিক মানবীয় গুনাবলী/চরিত্রঃ

ক) ইচ্ছা শক্তি ও সিদ্বান্ত গ্রহন শক্তি
খ) প্রবল বাসনা
গ) উচ্চাশা ও নির্ভীক সাহস
ঘ) সহিষ্নুতা ও দৃঢ়তা
ঙ) তিতিক্ষা ও কৃচ্ছ্রসাধনা
চ) বীরত্ব ও বীর্যবত্তা
ছ) সহনশীলতা ও পরিশ্রমপ্রিয়তা

জ) উদ্দেশ্যের আকর্ষন ও সে জন্য সব কিছুর উৎসর্গ করারপ্রবনতা
ঝ) সর্তকতা
ঞ) দূরদৃষ্টি ও অন্তরদৃষ্টি, বোধশক্তি ও বিচার ক্ষমতা
ট) ইচ্ছাবাসনা
ঠ) স্বপ্ন সাধনা ও উত্তেজনার সংযমশক্তি ত্রবং অন্যান্য মানুষকে আকৃষ্ট করা।

২. ইসলামী চরিত্রঃ
এটি মৌলিক মানবীয় চরিত্রের বিশুদ্ধরূপ। তরবারী সাধারন অবস্থায়, মৌলিক মানবীয় চরিত্র + তরবারী মুজাহিদের হাতে + ইসলামী নৈতিক চরিত্র।

নেতৃত্ব বন্টনে খোদার নীতির সারকথাঃ

১. মৌলিক মানবীয় গুনাবলী যার যত বেশী সে নেতৃত্ব পাবে।

২. ইসলামী নৈতিকতার উপস্থিতি মৌলিক মানবীয় গুনাবলী কম হলেও নেতৃত্ব পাবে।

৩. উপরোক্ত দুইটির সমন্বয় হলে নেতৃত্ব অবশ্যম্ভাবী তবে নেতৃত্ব ফেরেশতা দিয়ে যাবে না। ময়দানে দ্বন্দ সংঘাত পেরিয়ে তা অর্জন করতে হবে

৪. মৌলিক মানবীয় চরিত্র +১০০% জড়শক্তি=সাফল্য।

৫. ইসলামী নৈতিক চরিত্র+২৫% জড়শক্তি = সাফল্য।

ইসলামী নৈতিকতার পর্যায়ঃ ৪ টি

১. ঈমানঃ মৌলিক তিনটি (মু,মিন)

ক. আল্লাহর উপর ঈমানঃ অস্তিত্ব, নাম ও গুনাবলী, ক্ষমতা, হুকুম আহকাম।

খ. রাসূলের উপর ঈমানঃ তার নব্যুয়াত ও রিসালাত স্বীকার, তার সমগ্র আদর্শপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা, সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দেওয়াও ভালো।

গ) আখরাতের উপর ঈমানঃ পুনরুস্থান ও হাশরে বিশ্বাস, সে কেন্দ্রিক জীবন গঠন।

২. ইসলাম (মুসলমান)

ঈমানের বাস্তবরূপ, বৃক্ষ থেকে বীজ নির্ধারণ, আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পূর্ণ অনুসরনই ইসলাম।

৩. তাকওয়া (মুত্তাকী): এর অর্থ ভয় করে বেঁচে থাকা। মনের সে অনুভূতি যা আল্লাহর প্রবল ভীতির সাথে সাথে দায়িত্বানুভূতি, জবাবদিহির যাবতীয় কাজে হালাল-হারাম বাছাই ও অনুভূতি জাগ্রত করবে।

তাকওয়া ৩প্রকার :যথা-

ক) তাকওয়ায়ে খাসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাবতীয় শিরক থেকে বেঁচে থেকে আল্লাহর হুকুম পালন করা।

খ) তাকওয়ায়ে আমঃ যাবতীয় শিরক থেকে নিজেকে রক্ষা করা।

গ) তাকওয়ায়ে আখাচ্ছল খাসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিরক থেকে বেঁচে থাকা নয় কুফরীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন।

৪. ইহসান (মুহসীন);
ইসলামী জীবনপ্রাসাদের সর্বোচ্চ পর্যায় আল্লাহ, রাসূল ও ইসলামের প্রতি এমন ভালাবাসা যা নিজেকে তাদের জন্য উৎসর্গ করতে শিখায় তাকওয়া-সরকারী কর্মচারীর যথার্থ দায়িত্ব পালন।

ইহসানঃ শুধু দায়িত্ব পালন নয়, দেশের জন্য কষ্ট, ত্যাগ, কুরবানী স্বীকার, ইসলামের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মুহসিনপ্রয়োজন মারফাতের পথ-এ চার পর্যায় অতিক্রম করে তারপর অন্যথায় দুর্ঘটনা ঘটবে।

ইসলামী আন্দালনের নৈতিক ভিত্তির ১০ টি পর্যায়ঃ

নেতৃত্বের গুরুত্ব, ২. সৎ নেতৃত্বপ্রতিষ্ঠা দ্বীন ইসলামের মূল লক্ষ্য, ৩. নেতৃত্বর ব্যাপারে খোদার নিয়ম, ৪. মানুষের মানবীয় চরিত্রের বিশ্লেষণ, ৫. ইসলামী নেতিকতা, ৬. নেতৃত্বের ব্যাপারে খোদায়ী নীতির সারকথা, ৭. মৌলিক মানবীয় চরিত্র ৮. ইসলামী নৈতিকতা শক্তির তৎপরতা, ৯. ইসলামী নৈতিকতার ৪ টি পর্যায়, ১০. ভুল ধারনার অপনোদন

জুন-২১ কুরআন অধ্যয়নঃ সূরা ফুরকান (৬১-৭৭) নং

২৪

বই ঃ গঠনতন্ত্রের ধারা-২,৩,৪,৫,৬,৭,৯,১০,১১,৫৩, পরিশিষ্ট-১ ২৮

জুলাই-২১ কুরআন অধ্যয়নঃ সূরা ইয়াসিন (২০-২৯) নং আয়াত
৩০
বই ঃ রুকনিয়াতের আসল চেতনা ৩২

আগষ্ট-২১ কুরআন অধ্যয়নঃ সূরা মুনাফিক (৯ ও ১০) নং আয়াত ৩৪
বই ঃ ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ ৩৬

সেপ্টেম্বর-২১ কুরআন অধ্যয়নঃ সূরা তওবা (৬ষ্ট রুকু) নং আয়াত ৩৮
বইঃ ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি ৪০

অক্টোবর-২১ কুরআন অধ্যয়নঃ সূরা ইনফিতার ৪২
বই ঃ সিরাত ইবনে হিশাম ৪৪

নভেম্বর-২১ কুরআন অধ্যয়নঃ দারসুল হাদীস (অবৈধ উপার্জনের পরিনতি)
৪৬
বই ঃ সিরাত ইবনে হিশাম ৪৪

ডিসেম্বর-২১ কুরআন অধ্যয়নঃ সূরা মাউন (সম্পূর্ণ) ৪৮
বইঃ সিরাত ইবনে হিশাম ৪৬